দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

চীনা ব্রিফ নিয়ে পঞ্চমবাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠছে

পৃঃ ১২

আদালত বা সংসদের হস্তক্ষেপ ছাড়া রামমন্দির বিতর্কের অবসান অনিশ্চিত

পৃঃ ১৪

৭০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ২৮ আগস্ট ২০১৭।। ১১ ভাদ্র - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

কেরলে রক্তের হোলি

খুনি সি পি এম

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১১ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৮ আগস্ট - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

পুরভোটে বিজেপির উত্থান নেত্রীর হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছে
□ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : দিদিই বোলার, দিদিই ব্যাটসম্যান
□ সুন্দর মৌলিক □ ১১

চীনা ব্রিফ নিয়ে পঞ্চমবাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠেছে
□ দেবীপ্রসাদ রায় □ ১২

আদালতের বা সংসদের হস্তক্ষেপ ছাড়া রামমন্দির বিতর্কের অবসান অনিশ্চিত □ ধর্মানন্দ দেব □ ১৪

ম্যাগনা কারটা ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্র
□ প্রণব মজুমদার □ ১৬

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি : রক্তের মধ্যেই হিংসা
□ রাকেশ সিনহা □ ১৯

বাম-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সঙ্ঘের ঐতিহাসিক প্রতিবাদ
□ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ২১

মোদীর স্বপ্নের ভারত গড়া মোটেই অসম্ভব নয়
□ এম জে আকবর □ ২৭

জীবন্ত-জাগ্রত গণদেবতা শ্রীগণেশ
□ সমীর পুরকায়স্থ □ ৩১

কর্মফল কী ও কেন? □ রবীন সেনগুপ্ত □ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** □ **অঙ্গনা : ৩৪** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **রঙ্গম : ৩৬-৩৭** □ **অন্যরকম : ৩৮** □ **চিত্রকথা ও শব্দরূপ : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মহাজোট : একটি নতুন প্রহসন

এখন জাতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় মহাজোট। লালু-সোনিয়া-রাহুল-মমতা— সব নেতাই এখন অঙ্ক মেলাতে ব্যস্ত। তাদের ধারণা মহাজোট হলেই ২০১৯-এ এন ডি এ-র ভরাডুবি সুনিশ্চিত। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে মহাজোট নিয়ে আলোচনা।

স্বস্তিকা

স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের ১২৫ বর্ষ

ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষত তাঁর শিকাগো ভাষণ একটা মাইল ফলক। বর্তমান ভারতেও হিন্দু জাতীয় চেতনা জাগরণে এই ভাষণটি সমান প্রাসঙ্গিক। বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি সংরক্ষণযোগ্য।

লিখেছেন : স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পুলক নারায়ণ ধর, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, ড. রাকেশ দাশ, কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-তে সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে।
দাম ১০.০০ টাকা। সত্বর কপি বুক করুন।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কর্নেল পুরোহিতের জামিনের পর

মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিতকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়াছে সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিমকোর্টের রায়টি লক্ষণীয়। সুপ্রিমকোর্ট জানাইয়াছে যে কোনও এক সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি ক্ষতিকর ভাবনা-চিন্তা রহিয়াছে—কেবল এই অভিযোগে অভিযুক্তের জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করা যায় না। বস্তুত প্রশ্ন উঠিতেই পারে, শুধু এই অভিযোগে কাহাকে কি জামিন দেওয়া যাইবে না? ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের বস্ত্র শিল্পাঞ্চল মালেগাঁও-এ দুইটি বিস্ফোরণ হয়। ওই বিস্ফোরণে সাতজন নিহত ও প্রায় একশত ব্যক্তি আহত হন। সেই বিস্ফোরণে যুক্ত থাকিবার অভিযোগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন নেত্রী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর ও পরে কর্নেল পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিমধ্যে নয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অব অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট (মকেকা) হইতে পুরোহিতের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। নয় বৎসর জেলবন্দি রাখিবার পরও তাঁহার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয় নাই। তাহা হইলে তাঁহাকে খামোকা জেলবন্দি রাখিবার অর্থ কী?

কর্নেল পুরোহিতকে গ্রেপ্তারের কারণে আরও এক উদ্বেগের প্রশ্ন উঠিয়াছে। তাহা হইল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি কি নিজেদের লোকজনকে সেনাবাহিনীতেও অনুপ্রবেশ করাইতে সক্ষম হইয়াছে? নয় বৎসর পর এই প্রশ্ন সঙ্গত কিনা— এই ভাবনা ঠিক নয়। কেননা দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অভিনব ভারতের হইয়া বিস্ফোরণ ঘটাইবার অভিযোগে কর্নেল পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার অভিযোগে প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুরকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ভারতে হিন্দু সন্ত্রাসবাদ শাখা বিস্তার করিতেছে, এমনই অভিযোগ তুলিয়াছিল তৎকালীন ইউপিএ সরকার। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে সাধ্বী প্রজ্ঞাকে ইতিমধ্যে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ) চার হাজার পৃষ্ঠার যে চার্জশিট জমা দিয়াছে তাহাতে শ্রীকান্ত পুরোহিত, প্রজ্ঞা ঠাকুরকে মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মালেগাঁও মুসলমান প্রধান অঞ্চল বলিয়া সেই জায়গাকে অভিযুক্তরা টার্গেট করিয়াছিল বলিয়া চার্জশিটে দাবি করা হয়। বিস্ফোরণের জন্য পুরোহিত আর ডি এক্স সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ।

শীর্ষ আদালতের এই জামিনের আবেদন মঞ্জুরির অর্থ ইহা নহে যে শ্রীকান্ত পুরোহিত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। কিন্তু নয় বৎসর অতিবাহিত হইবার পরও এই মামলার শুনানি আর কতদিন চলিবে? অভিযোগের বিচার এত বিলম্বিত হইবে কেন? সমঝোতা এক্সপ্রেসের বিস্ফোরণের মামলার ক্ষেত্রেও এই বিলম্ব লক্ষ্য করা গিয়াছে। দুইটি মামলার ক্ষেত্রেই এই বিলম্বের কারণ কি অভিযুক্তরা হিন্দুসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত? প্রজ্ঞা ঠাকুরের মতো কর্নেল পুরোহিতেরও বক্তব্য তাহারা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বলি। এই তথাকথিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কেননা এই মামলায় অভিযোগ করা হইয়াছে যে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এই দুই মামলায় জড়িত। 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর এই তত্ত্ব এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। যদি এই অভিযোগের সামান্যও সত্য হয় তবে তাহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইবে। বাস্তবে কিন্তু এমন কিছু ঘটে নাই। তাই অত্যন্ত দ্রুত এই দুই বিস্ফোরণ মামলার বিচারের মীমাংসা হওয়া দরকার যাহাতে কোনটা দুধ আর কোনটা জল তাহা স্পষ্ট হইয়া যায়। হিন্দু জাতিকে কলঙ্কিত করিবার জন্য যাহারা এই ষড়যন্ত্র করিয়া নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ পূরণ করিতে সচেষ্ট তাহাদের কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার।

সুভাষিতম্

যথা চিত্তং তথা বাচঃ যথা বাচঃ তথা ক্রিয়া।

চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং চ সাধুনাং একরূপতা।।

মনের কথাই মুখে বলা এবং যা বলা হবে সেই মত ব্যবহারই সজ্জন লোকেরা করে থাকেন।

এন এম এম এল-র সভায় প্রস্তাব

নেহরু-সহ অন্যান্য প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় ব্যক্তিত্বদের তুলে ধরতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এনএমএমএল (নেহরু মিউজিয়াম মেমোরিয়াল অ্যান্ড লাইব্রেরী)-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটির আসন্ন বাৎসরিক সাধারণ সভায় 'সুশাসন' কথাটিকে ভরকেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সেইসব প্রধানমন্ত্রীদের কীর্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত হয়েছে। গৃহীত হতে চলেছে দেশ গঠনে যাদের সদর্থক ভূমিকা রয়েছে সেই সব কীর্তিমান মানুষদের জীবনগাথা যারা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন হতে চলেছে পূর্বতন জনসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি তথা মার্গদর্শক পণ্ডিত দীনয়াল উপাধ্যায়ের নাম। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা পদাধিকার বলে ওই সংস্থার সহ-সভাপতি রাজনাথ সিংহের অধ্যক্ষতায় প্রারম্ভিক সভাটি এই মাসের শেষেই হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেঠলি সম্প্রচার মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী, সংস্কৃতি মন্ত্রী মহেশ শর্মা ছাড়াও বিরোধী দলের মল্লিকার্জুন খাড়গে ও কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও ওই সভায় সংস্থার সদস্য হিসেবে যোগ দেবেন বলে খবর।

ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য অনুযায়ী যেহেতু নেহরুর একচ্ছত্র অবস্থানের বদলে অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের সংযোজিত করার প্রস্তাব রয়েছে তাই রমেশ ও খাড়গে এর বিরোধিতা করবেনই। ২০১৫-১৭ সালের অ্যাকশান টেকেন রিপোর্ট গতানুগতিকভাবে গৃহীত হওয়া ছাড়াও মূলত 'বিগত সকল প্রধানমন্ত্রীদের স্মারক নির্মাণ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের তালিকা তৈরিই সভার মুখ্য বিচার্য।'

গত ২০১৫ সালের এপ্রিলের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনিই সংস্থার সভাপতি হিসেবে এবারের ৪২তম সভায় পূর্বোল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছাড়াও কীভাবে প্রদর্শশাখাটির আরও উন্নয়ন করা যায় যাতে বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে সেই প্রসঙ্গ তুলবেন। সূত্র অনুযায়ী, সংস্কারের পর এটিকে 'সুশাসনের প্রদর্শশালা' হিসেবে নবরূপে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাবও সভায় আলোচিত হবে। সংস্কারিত প্রদর্শশালায় উঠে আসবে সমকালীন ভারতবর্ষের কথা যেখানে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর 'smart cities' পরিকল্পনার উল্লেখ বা আইএসআরও-এর বিজ্ঞানীদের মঙ্গলগ্রহে মানবহীন রকেট প্রেরণের মতো যুগান্তকারী ঘটনার বিবরণ।

প্রসঙ্গত এই এনএমএমএল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্মৃতিতে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাসভবন 'তিনমূর্তি'তে তৎকালীন সংস্কৃতি দপ্তরের আওতায় একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রদর্শশালার একমাত্র আকর্ষণ ছিলেন জওহরলাল। সংস্থাকে নতুন চেহারা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি 'আন্তর্জাতিক বরাত' (টেন্ডার) আহ্বান করেছে। সংলগ্ন দু'টি সম্ভাব্য জায়গার মধ্যে একটিতে জওহরলাল মেমোরিয়াল ফান্ডের কার্যালয় হবে যেটির মাথায় এখন রয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। এই সূত্রে সংস্কৃতি মন্ত্রী মহেশ শর্মা সংস্থার সংবিধান উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'নেহরুজী তো বটেই তবে আরও যাঁরা আধুনিক ভারত নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন তাঁদের কথাও এখানে তুলে ধরার কথাই বলা আছে। সেই কাজটিই দেশবাসী দেখতে উৎসুক।

দূরদর্শন দেখাবে লোক আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গঠিত লোক আদালতে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া মামলার দৃশ্যরূপ প্রদর্শন করবে দূরদর্শন। সহযোগিতায় ন্যাশনাল লিগাল সারভিসেস অথরিটি (এনএলএসএ)। এর উদ্দেশ্য, মামলা-মকদ্দমার নিষ্পত্তিতে লোক আদালতের কার্যকারিতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। সেই সঙ্গে জানানো, লোক আদালতের ব্যবহার বাড়লে বিচারব্যবস্থার ওপর চাপ অনেকাংশে কমে যায়। এই সিরিজের প্রথম পর্ব, যার নাম 'অকেলে নহি হ্যায় আপ', দেখানো হবে এ মাসের শেষ রবিবার (২৭ আগস্ট)। এই পর্বে থাকবে এমন এক সংসার পরিত্যক্ত বাবার কাহিনি যার সন্তানসংখ্যা সাতজন। তিনি কীভাবে লোক আদালতের সাহায্যে তাঁর হৃতসম্মান ফিরে পেয়েছিলেন, কাহিনির বিষয় সেটাই। এন এল এস এ-র পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত বলা হয়েছে, 'অকেলে নহি হ্যায় আপ দেশের তিনটি লোক আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া ২৬টি মামলার দৃশ্যরূপ।' দূরদর্শনের এই সিরিয়ালটি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপক মিশ্রের ভাবনার ফসল।

কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানকে সমর্থন নয় : ইজরায়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোনও অবস্থাতেই ইজরায়েল কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানকে সমর্থন করবে না। সম্প্রতি ইজরায়েলের পক্ষ থেকে একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। ইজরায়েলের এই ঘোষণা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। দীর্ঘদিন ধরে ভারত এবং পাকিস্তানের সুসম্পর্কের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত কাশ্মীর সমস্যা। এ যাবৎকাল ইজরায়েল কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে বিশেষ মুখ খোলেনি। যদিও বারেবারে জানিয়েছে ইসলামিক সন্ত্রাসের বীজ উপড়ে ফেলতে তারা ভারতের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে চায়। ভারতের কাছে এই মুহূর্তে প্রধান সমস্যা হলো পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সীমান্ত সন্ত্রাস। যা প্রতিনিয়ত জম্মু ও কাশ্মীরকে অশান্ত করে চলেছে। ৯০-এর দশকের গোড়ায় দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে একাধিক বিবৃতিতে ইজরায়েল ঘোষণা করেছে, কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। সুতরাং এ ব্যাপারে তারা নাক গলাতে চায় না।

এদিকে ভারতের পশ্চিম এশিয়া বিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্র আভিয়ঙ্করের মতে ২০০৩ সালে পাকিস্তান এবং ইজরায়েলের মধ্যে সখ্য শুরু হবার পর এবং পাকিস্তানকে ইসলামি দুনিয়ার অন্যতম প্রধান দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর, কাশ্মীর নিয়ে ইজরায়েলের এই ঘোষণা যথেষ্ট অর্থবহ। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে ইজরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শারুনের ভারত সফরের পর দিল্লি যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল তাতে কাশ্মীর নিয়ে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কোনও বিবৃতি ছিল না। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক ইজরায়েল সফরেও কাশ্মীর প্রসঙ্গ সেভাবে উঠে আসেনি। সম্প্রতি আমেরিকান জেউইশ কমিটির উদ্যোগে ভারতীয় সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদদের একটি প্রতিনিধিদল ইজরায়েল সফর করে। সেখানে, একটি ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক কাশ্মীর প্রসঙ্গে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন।

মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত কর্নেল পুরোহিত জামিনে মুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্রে মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিতকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল সুপ্রিমকোর্ট। এই সেনা অফিসারের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ দমন আইনে (মকেকা) মামলা আগেই খারিজ হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মুম্বাই থেকে ২৭০ কিলোমিটার দূরে বস্ত্র শিল্পাঞ্চল মালেগাঁও-এ পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে মোট ৭ জন নিহত ও প্রায় ১০০ জন আহত হন।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অভিনব ভারতের হয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর ষড়যন্ত্র করেছেন বলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন নেত্রী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর-সহ কর্নেল পুরোহিতকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে কর্নেল পুরোহিত তাঁর প্রাপ্য বেতন ও ভাতার ৭৫ শতাংশ পাবেন বলে জানা গেছে।

জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা, শাস্তির মুখে পৌরপ্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ পৌরসভায় বার্ষিক সভার শেষে বন্দে মাতরম্ গাওয়া হচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় এ আই এম আই এম এবং কংগ্রেসের দু'জন পৌরপ্রতিনিধি উঠে দাঁড়াতে অস্বীকার করেন। এর একদিন পর অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে পুরসভার পক্ষ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, দুই পৌর প্রতিনিধির কাজের প্রতিবাদে শিবসেনা এবং বিজেপি কাউন্সিলররা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। মেয়র ভগবান ঘাড়ামোড়ে তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এ আই এম আই এম)-র সৈয়দ মতিন এবং কংগ্রেসের সোহেল শেখকে একদিনের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন। কয়েক মাস আগে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল মিরাট এবং বারাণসী পুরসভায়। এ আই এম আই এমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা করার অধিকার কারোর নেই। দেওয়া হয়েছে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাসও। এদিকে গত ১১ আগস্ট মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক রাজ পুরোহিত স্কুল-কলেজে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করার দাবি করেছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাদের পরিচালিত প্রতিটি স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার রীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'প্রেম জেহাদ'-এর তদন্তে এন আই এ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'প্রেম জেহাদ'-এর নগ্নরূপ এবার চোখের সামনে ধরা পড়ল। কেরলে বিগত বহু বছর ধরেই 'প্রেম-জেহাদ' নামে জঙ্গি কার্যকলাপের একটি নয়া দিক প্রকাশ্যে এসেছিল। যাতে জঙ্গি প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত মুসলমান যুবকদের কাজ ছিল ভেক ধরে হিন্দু যুবতীদের আকর্ষণ করা এবং প্রেমের সুযোগ নিয়ে তাঁকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা। আর বিয়ের পর ওই হিন্দু যুবতীদের জঙ্গি কাজে নিয়োগ করা। কিন্তু হাদিয়া কাণ্ডে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিল। এতটাই যে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে তদন্তের ভার দিল সুপ্রিম কোর্ট।

ঘটনার শুরু গত বছরের আগস্টে। মালাপ্পুরম নিবাসী ২৪ বছরের হাদিয়া একটি মুসলিম ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে শাফিন জাহান নামে এক মুসলমান যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারপর গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর হাদিয়ার নাম হয় আখিলা। বিয়ের দু'দিনের মধ্যেই হাদিয়ার

শাফিন জাহান ও হাদিয়া

বাবা কে এম অশোকান কেরল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ইতিমধ্যেই হাদিয়াকে সিরিয়ায় পাঠানোর ছক কষে শাফিন। সে হাদিয়াকে বলে আরবে তার চাকরির স্থান পরিবর্তন হয়েছে। হাদিয়াও সরল মনে বিশ্বাস করে কোর্টে জানায় সে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। হাদিয়া বুঝতে না পারলেও জাহানের গতিবিধিতে কেরল হাইকোর্টের বিচারপতিরা অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। তাঁরা কেরল পুলিশকে তদন্তের ভার দেন। যদিও কমিউনিস্ট সরকারের পুলিশ শাফিন জাহানের গতিবিধিতে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পায় না এবং তারা একপ্রকার ক্লিনচিটও দেয় তাকে। প্রসঙ্গত, কোচিতে একটি হস্টেলে পাঠানো হয়েছিল হাদিয়াকে। ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে আসে, জাহান দুটি হোয়াটসআপ গ্রুপ 'এসপিডিআই কেরলম' ও 'থানাল'-এর অ্যাডমিন। যে গ্রুপগুলিতে মানসি বারাকুইয়ের মতো আই এস জঙ্গিরা সক্রিয় সদস্য।

ইতিমধ্যেই কেরল হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জাহান সুপ্রিম কোর্টে যায়। আইনজীবী হিসেবে জোগাড় করে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলকে। সিব্বলকে আইনজীবী করার টাকা জোগাড় হলো কোত্থেকে সেই প্রশ্নও উঠছে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের জে এস কেহরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জাহানের আবেদন নাকচ করে পুরো ঘটনার তদন্তভার এন আই এ-কে দেয়। কপিল সিব্বল তার দেশদ্রোহিতার নীতি মেনে এর বিরোধিতা করলেও শীর্ষ আদালত জানায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আরভি রবীন্দ্রনের তদারকিতে এই তদন্ত চলবে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় : তিন তালাক অসাংবিধানিক, নতুন আইন না হওয়া অবধি নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এক যুগান্তকারী রায়ে সুপ্রিমকোর্ট জানিয়ে দিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত তিন তালাক প্রথা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। সেই সঙ্গে সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ছ'মাস মুসলমান পুরুষেরা তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হতে পারবেন না। এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রকে তিন তালাকের বিকল্প আইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান বিচারপতি জে. এস কেহরের নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চ তাদের রায়ে বলেন, 'যতদিন আইন প্রণয়ন করা না হয় অর্থাৎ আগামী ছ'মাস মুসলমান স্বামীরা তিন তালাক উচ্চারণ করতে পারবেন না।' সর্বোচ্চ আদালতে তিন তালাকের আইনগত বৈধতা নিয়েও আলোচনা হয়।

এই যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করেন প্রধান বিচারপতি জে. এস. কেহর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি কুরিয়ন জোসেফ, রোহিনটন ফলি নরিম্যান, উদয় উমেশ ললিত এবং আবদুল নজির। বিচারপতি নরিম্যান এবং উদয়উমেশ ললিত বলেন, তিন তালাক প্রথা অসাংবিধানিক এবং সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের বিরোধী। উল্লেখ্য, এই অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সাম্য এবং নিরাপত্তার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে সংবিধানে। সেইসঙ্গে ধর্ম, জাতপাত, লিঙ্গ এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিচারপতি কুরিয়ন জোসেফ বলেন, তিন তালাক শরিয়ত এবং কোরানের মূল আদর্শের পরিপন্থী। সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল শিখ, খ্রিস্টান, পার্সি, হিন্দু এবং মুসলমান বিচারপতিদের নিয়ে। মোট সাতটি আবেদনের শুনানি হয়। এর মধ্যে রয়েছে তিন তালাককে চ্যালেঞ্জ করে মুসলমান মহিলাদের পাঁচটি পিটিশন। রায়ে সর্বোচ্চ আদালত বলেছে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথা হিসেবে তিন তালাক 'সব থেকে জঘন্য' এবং 'একেবারেই কাম্য নয়।' যতই কিছু ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তিন তালাককে 'বৈধ' বলে দাবি করুক, সর্বোচ্চ আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রের সমীক্ষা, পাঠ্যপুস্তকে ধরা পড়ল ১৩০০ ভুল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রের চলতি সমীক্ষায় জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পর্ষদ (এন সি ই আর টি) প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে মোট ১৩০০টি ভুল ধরা পড়ল। পর্ষদ দ্রুত ভুল সংশোধনের কাজে হাত দেবে। মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানান, সারা দেশের ৯০০ জন শিক্ষক এইসব ভুল সংশোধন করতে প্রায় ২৫০০ পরামর্শ দিয়েছেন। এ বছরের গোড়ায় এনসিইআরটি প্রায় এক দশক আগে প্রকাশিত তাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময়েই ভুল সংশোধন এবং নতুন তথ্য সংযোজনের জন্য পরামর্শ আহ্বান করা হয়েছিল। একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রকাশ জাভড়েকর জানান নতুন পাঠক্রম শুরু হবার আগেই ভুল সংশোধন করে ফেলা হবে। তিনি বলেন, ‘একটি পোর্টাল খোলা হয়েছে যা বই বাছা এবং কেনার ব্যাপারে স্কুলগুলোকে সাহায্য করবে। বণ্টনব্যবস্থাও আগের থেকে ভালো হবে।’ তিনি আরও জানান, স্কুলশিক্ষাকে আরও উন্নত করার জন্য এই প্রয়াস। আগামী ২ অক্টোবর থেকে ‘শিক্ষকদের প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরও দক্ষ’ করে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করবে। সারাদেশ থেকে প্রায় এগারো লক্ষ শিক্ষক এইসব শিবিরে যোগ দেবেন।

উবাচ

“কোনও নীতিবোধ ছাড়াই যে-কোনও মূল্যে নির্বাচনে জেতা এখন রাজনীতিতে সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে।”

ও পি রাওয়াত
নির্বাচন কমিশনার

রাজ্যসভায় গুজরাটে প্রার্থী নির্বাচনের প্রসঙ্গে

“গোরুর দুধ পান করে তাদের রাস্তায় ছেড়ে দেবেন না। এটা করা যাবে না। আমাদের এই প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে।”

যোগী আদিত্যনাথ
মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ

কৃষকদের ঋণদান সংক্রান্ত এক সভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

“১৯৯২ সালে বাবরি ধাঁচা ধ্বংস হবার পর থেকে প্রশ্নটা উঠছে। আমি বলব, বিষয়টির সঙ্গে জড়িত সব পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে অথবা আদালত যেমন নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী রামমন্দির নির্মাণ করা উচিত।”

অমিত শাহ
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে

“ভারত কোনও দেশের উপর আগে থেকে হামলা করবে না কারণ আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের সেনা পুরোদস্তুর তৈরি রয়েছে।”

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ডোকলামে ভারতের অবস্থান প্রসঙ্গে

“যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী হই তখন ৪৩ লক্ষ শিশু স্কুলের বাইরে ছিল। আমি ‘স্কুল চলে হাম’ অভিযান শুরু করি।”

শিবরাজ সিংহ চৌহান
মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

মধ্যপ্রদেশের প্রাথমিক স্কুলশিক্ষায় অগ্রগতি প্রসঙ্গে

পুরভোটে বিজেপির উত্থান নেত্রীর হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছে

দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর ডাকে বিজেপি বিরোধী দলের বৈঠক হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বৈঠকের মধ্যমণি। বৈঠকের উদ্দেশ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মহাজোট করে কেন্দ্রে বিজেপিকে হারানো। বৈঠকের পর দিল্লিতে মমতা সাংবাদিকদের বলেছেন, 'বিজেপি বিরোধী সব দল একযোগে লড়াই করে উনিশ সালে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাবই'। ভাল কথা। কিন্তু তিনি মহাজোট করবেন কাদের নিয়ে। এই মুহূর্তে একমাত্র কংগ্রেস ছাড়া বিজেপি বিরোধী সর্বভারতীয় দল বলতে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দিদি বলেছেন, ১৮টি দল তাঁর সঙ্গে আছেন। কিন্তু বাস্তবে আটটি দলও তাঁর সঙ্গে নেই। তৃণমূল নেত্রী যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তাঁর বিজেপিকে ভারত ছাড়া করার ডাকে সাড়া দিয়েছে কংগ্রেস, লালুর চরম দুর্নীতিগ্রস্ত দল আর জে ডি, অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি, বিএসপি এবং তামিলনাড়ুর ডিএমকে। এরা কতটা বিজেপি বিরোধী আর কতটা ক্ষমতা লোভী সে প্রশ্নের বিচার করা যেতেই পারে। মমতা বলেছেন, আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে বিজেপির বিরুদ্ধে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেবে। যাতে ভোট বিভাজনের সুযোগ নিয়ে বিজেপি জিততে না পারে।

তত্ত্বগতভাবে নির্বাচনে 'একের বিরুদ্ধে এক' প্রার্থী দেওয়া হলে বিরোধীদের জেতার সুযোগ থাকে বেশি। কিন্তু ভারতের মতো বিশাল দেশে বাস্তবে তা সম্ভব নয়। সব রাজনৈতিক দলই আসন জিতে দলের শক্তি বাড়াতে চায়। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে চায় না। যেমন, উত্তরপ্রদেশে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি, মায়াবতীর বিএসপি এবং কংগ্রেস এক আসনে এক প্রার্থী ফরমূলা মানবে কি? কখনই নয়। বিহারে কংগ্রেস এবং আর জে ডি কোন দল হবে মহাজোটের নেতা তা নিয়ে কাজিয়া অনিবার্য। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আর তৃণমূলের জোট হলেও বামপন্থীরা অবশ্যই আলাদাভাবে প্রার্থী দেবে। বামফ্রন্টের শরিকরা যতই দুর্বল হয়ে পড়ুক না কেন তারা মমতার তৃণমূলকে একটি

গূঢ় পুরুষের কলম

আসনও ছাড়বে না। উল্টোদিকে, সম্প্রতি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হলেও সিপিএমকে মমতা বিশ্বাস করেন না। মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে সব বিরোধী দলকে একজোট হওয়ার ডাক দিবেন অথচ আবার বলছেন বামেরা ভণ্ড। বামেদের সঙ্গে জোট নয়। সিপিএম কট্টর বিজেপি বিরোধী দল। চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার পর তৃণমূলও বিজেপি বিরোধী হয়েছে। অথচ সিপিএম-তৃণমূল পরস্পরের বাপান্ত করছে। এই হচ্ছে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার মহাজোটের আসল চরিত্র। জোট শরিরকরা সকলেই সকলের শত্রু।

দিল্লির বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে বিজেপি বিরোধী মহাজোটে কেউ বা কোনো দলই মাতব্বরি করবে না। জোটের শরিকরাই সিদ্ধান্ত নেবেন কোন দল কত আসনে প্রার্থী দেবে। যেমন, উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদব এবং মায়াবতী একসঙ্গে বসে স্থির করবেন যে বিজেপিকে হারাতে তাঁরা কী কৌশল নেবেন। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেত্রী এবং প্রদেশকংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী আলোচনা করে ঠিক করবেন রাজ্যের ৪২টি আসনে কোন দল কোথায় প্রার্থী দেবে। বিহারে লালুর হাতে জোটের লাগাম থাকবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন রাজনীতির রাখিবন্ধন সম্ভব কি? অধীর চৌধুরীর সঙ্গে মমতার রাজনৈতিক সম্পর্ক যে কতটা তিক্ত তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন। সোনিয়া-রাহুলের নির্দেশে অধীরবাবু এখন ভিজে বেড়ালটি সেজে মমতার পা চাটবেন কিনা তা তিনিই বলতে পারবেন। যদিও দেশের বর্তমান রাজনীতিতে কেউ কারো স্থায়ী শত্রু বা বন্ধু নয়। তবুও আমি অধীর চৌধুরীকে যতটা জানি তাতে বলতে পারি যে মমতার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না। অধীরবাবু তৃণমূলকে তাঁর প্রধান শত্রু মনে করেন। বিজেপিকে নয়। তাই লোকসভার নির্বাচনের আগেই অধীর চৌধুরীকে তাঁর অনুগামী সহ কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেসের বিভাজন অনিবার্য। তাছাড়া আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে চলতি বছরে বেশ কয়েকটি রাজ্যে এবার বিধানসভার ভোট হবে। এই ভোটের ফলাফল নিঃসন্দেহে উনিশের লোকসভার ভোটে প্রভাব ফেলবে। বিজেপির 'ক্লিন সুইপ' হলে দিদির মহাজোট তখন আকাশ কুসুম স্বপ্ন হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যে সদ্যঅনুষ্ঠিত পুরভোটে বাংলার মানুষ একটা বার্তা দিয়েছে। তাঁরা তৃণমূলের বিরোধী হিসেবে বিজেপিকেই পছন্দ করছেন। সিপিএম অথবা কংগ্রেসকে নয়। সিপিএম এবং কংগ্রেস একটি আসনও জেতেনি। নলহাটিতে ফরোয়ার্ড ব্লক একটি আসন জিতে বামপন্থীদের মুখরক্ষা করেছে। অন্যদিকে বিজেপি ৬টি আসনে জিতেছে এবং অধিকাংশ ওয়ার্ডে দ্বিতীয় স্থানে আছে। চলতি বছরে যে সব রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হবে সেখানে বিজেপি জিতলে বাংলার তৃণমূল বিরোধী ভোটদাতারা দলে দলে বাম এবং কংগ্রেস শিবির ছেড়ে বিজেপির পতাকার তলায় জোটবদ্ধ হবেন। এই সহজ সরল কথাটা বোঝাতে কোনো প্রচারের প্রয়োজন নেই। ■

দিদিই বোলার, দিদিই ব্যাটসম্যান

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

সদ্য হয়ে যাওয়া সাতটি পুরসভায় নির্বাচনের ফল দেখে অনেকের টেনিদার সেই গল্পটা মনে পড়তে পারে। সে ছিল এক আশ্চর্য ফুটবল ম্যাচ। আমন্ত্রিত খেলোয়াড় হিসাবে বর্ষাকালে গ্রামের মাঠে পটলডাঙার ভজহরি মুখোপাধ্যায় ওরফে টেনিদা খেলতে নেমেছিলেন। বৃষ্টি মুষলধারে। পাশের পুকুর ভেসে গেল। দুই দলের সব খেলোয়াড় মাছ ধরতে শুরু করে দিল। কিন্তু রেফারি নিয়মনিষ্ঠ থেকে খেলা বন্ধ করলেন না। টেনিদাও খেলা ছেড়ে মাছ ধরতে গেলেন না। ফাঁকা গোলে একের পর এক শট। মোট বত্রিশটি গোল করে তবে থামেন।

পশ্চিমবঙ্গেও বর্ষার ভোটে একাই গোল দিয়ে গেলেন দিদিভাই। ক্রিকেট-প্রেমী দিদি বাইশ গজের ভোট ময়দানে যেন একাই বোলার, একাই ব্যাটসম্যান। সব রান তাঁর। সব উইকেট তাঁর। শুধু তাঁর। একার। দেড়শো ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪২ টিতেই ঘাসফুল ফুটেছে। দেড়শোয় দেড়শো না পাবার ব্যর্থতায় দিদি নিশ্চিত চোখের জল ফেলেছেন। রেফারিকে দুষেছেন। কারণ, রেফারি নির্বাচনে আরও জল ঢালার সুযোগ করে দিলে ওই আটটিতেও তিনিই গোল করতেন।

একশোয় একশো পেতে হবে। এটাই নাকি এখনকার ট্রেন্ড। সব বাবা-মা নাকি ছেলেমেয়েদের উপরে এমন চাপ দেন। সেটা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও মিথ্যা নয়। শুধু বাবা, মায়েরা নন, রাজ্যের সকলের দিদিও ফার্স্ট হতেই চান। কোনও সেকেন্ডও রাখতে চান না। একেই বলে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

যদি কেউ সেকেন্ড হয়ে যায় তবে তার গর্দান নিতে হবে। সেই সব সেকন্ডকে মেরেধরে, ভয় দেখিয়ে, শাসিয়ে ফার্স্টের ঘরে ঘাড় ধরে নিয়ে আসতে হবে। পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতিতে এ রোগ নতুন নয়। এ রোগ তিনি রাজনৈতিক গুরু বামফ্রন্টের থেকে পেয়েছেন। বামেরা তাদের ক্ষমতার স্বর্ণযুগে 'বিরোধীদের একটিও ভোট দিবেন না' কথাটি শুধু মুখে না বলতে হাতে কলমে করে দেখিয়েছে। কেশপুরে নন্দরানি ডলের বিজয়গাথা বাংলা কখনও ভুলবে না।

রাজনীতিকে বিরোধীশূন্য করার এই তাড়না গণতন্ত্রের পক্ষে কতটা ঠিক তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। বরং মনে রাখা দরকার যারা সেই নীতি নিয়ে চলেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে। কোথায় নন্দরানি ডলরা?

দেশের অনেক রাজ্যেই গত লোকসভা নির্বাচনে প্রায় বিরোধী শূন্য ফল হয়েছে। কিন্তু সেই ফলে এমন অসততার অভিযোগ ওঠেনি। 'কংগ্রেস-মুক্ত' ভারতের স্লোগান তুলেছিল বিজেপি। করেও দেখিয়েছে। তাহলে বিরোধী-মুক্ত করার স্লোগান ওঠেনি। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা নতুন স্লোগান দিয়েছেন— 'বিজেপি-মুক্ত' ভারত। লক্ষ্য সর্বত্র বিজেপিকে পৌঁছে দেওয়া। দিদি সেটা করুন। কিন্তু বিরোধীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা তা ব্যুমেরাং হতে দেখেছে বামেরা। আপনাকেও দিন গোনা শুরু করতে হবে। মা-মাটি-মানুষ অত দম্ভ আর দর্প পছন্দ করে না।

—**সুন্দর মৌলিক**

চীনা ব্রিফ নিয়ে পঞ্চমবাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠছে

দেবী প্রসাদ রায়

সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিকে ড. শামসুন আলমের চীন-ভারত সংক্রান্ত লেখাটিতে ভারতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা চৈনিক ধারাবাহিক ধূর্ত নেতৃত্বের প্রশংসা করে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বকে অন্তরের সমস্ত বিষ ঢেলে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসের জন্য ধিক্কার জানাই। নেহরু ব্যক্তিগত ভাবে আন্তর্জাতিক হাততালি (বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কাছ থেকে) পাবার তীব্র লালসায় চীনের অধীনস্থ দেশ হিসেবে তিব্বত দখলকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বাস্তবে তিব্বত কখনোই চীনের অধীনস্থ দেশ ছিল না--- দীর্ঘ ইতিহাসে পরস্পরের কিছু অঞ্চল সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত হওয়ার বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া। বরং তিব্বতের দীর্ঘ ২০০০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায় যে বেশ কিছু সময় তিব্বতই আধিপত্য বিস্তার করেছিল চীনের উপর। উদাহরণ স্বরূপ তিব্বতের ৩৬তম রাজা চীনের বহুপ্রদেশ দখল করে পোতালা প্রাসাদের সামনে বিজয়স্মারক ফলক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ১৯৫০ সাল অবধি অস্তিত্ববান ছিল। ৩৭তম রাজার আমলে আয়োজিত বিতর্ক সভায় ভারত থেকে আমন্ত্রিত বৌদ্ধ পণ্ডিতরা (যেমন পদ্মসম্ভব) বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে চীনা পণ্ডিতদের পরাজিত করেন। তিব্বতে ভারতের বৌদ্ধধর্মরূপই প্রাধান্য লাভ করে যা পরে অতীশ দীপঙ্কর (নালন্দা) আরও বিকশিত করেন। চীনের ভারত বৈরিতার শুরুও তখন। ৩৩তম রাজা সঙ-সেন-গ্যাম্পোর আমলে এক তরুণ মন্ত্রী ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরিত হন। তিনি ফিরে তাঁর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা নিয়ে তিব্বতীয় লিপির উদ্ভাবন ও প্রচলন করেন। মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিস খানের আক্রমণে চীন ও তিব্বত দুই-ই স্বাধীনতা হারায়। মোঙ্গলরাজার অধীন হয় তিব্বত সেই প্রথম, চীনের নয়। কিছুকালের মধ্যে মোঙ্গলরাজ কুবলাই খান লামাদের পাণ্ডিত্যে বিশেষ প্রভাবিত হন। লামা সোনাম গিয়াটগো মোঙ্গলরাজ আলতাব খানকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। এই আলতাব খানই সোনাম গিরাটসোকে সর্বপ্রথম দলাই লামা (জ্ঞানের মহাসাগর) আখ্যা দেন। পূর্বসূরীদের সম্মান করে গিয়াটসো নিজেকে তৃতীয় দলাই লামা বলে পরিচিত করেন। তিব্বতের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দমন করে মোঙ্গলরাজ ঘুসুরি খান পঞ্চম দলাই লামাকেই তিব্বতের প্রশাসক হিসেবে ঠিক করে ফিরে যান। ইতিমধ্যে মোঙ্গলদের আর একটি শাখার আক্রমনে চীনা রাজবংশ মিং-এর অবসান হয় ও মোঙ্গলরাজের নিজস্ব চিং-বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। চিংদের পঞ্চম লামার প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণ দেখে পঞ্চম দলাইলামা পিকিং যান এবং সেখানে চিং-রা তাঁকে স্বাধীন রাজার মর্যাদা দেন। পরবর্তীকালে চিং-রা তিব্বতকে কুক্ষীগত করার প্রয়াসে দলাই লামা পদটি অবলুপ্তির চেষ্টা করলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে 'তিব্বত' বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'নিষিদ্ধ দেশ'-এ পরিণত হয় চীনা চক্রান্তে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা ব্যবসাবাণিজ্য নির্বিঘ্ন করার জন্য সম্ভাব্য রাশিয়ান আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে কাশ্মীরের উত্তর রাশিয়া সংলগ্ন কিছু অঞ্চলকে চীনা আধিপত্যাধীন করার সুযোগ দিয়ে এবং চীনের অধীনে তিব্বতকে এক Suzerain (আংশিক নিয়ন্ত্রণ) রাষ্ট্র করে দিয়ে চীনকে সন্তুষ্ট করে। কার্যত স্বাধীন প্রশাসনে তেমন কোনো বিঘ্ন না আসায় তিব্বত প্রশাসক দলাই লামারা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাননি। ব্রিটিশের কূটকাচালি বোঝাও তাদের সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের আধুনিক পর্বে এই সেদিনও ইঙ্গ-তিব্বত চুক্তি সম্পাদন করে ব্রিটিশ সরকার, চীনাপ্রশাসন নিরপেক্ষ ভাবে। এরপর চীনা হস্তক্ষেপ প্রবণতা বাড়তে দেখে Suzerainty-র জন্য থাকতে দেওয়া চীনা সৈন্যদের বিতাড়িত করেন ত্রয়োদশ দলাই লামা এবং ১৯১২ সালে লাসাতে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'সুজারেনটি'র অবসান ঘটান।

Suzerainty-র কেন্দ্রস্থ কূটনীতি বজায় রাখার স্বার্থে ব্রিটিশরা সিমলায় ১৯১৪ সালে চীন ও তিব্বত সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য এক কনভেনশন ডাকে। ম্যাকমোহনের মধ্যস্থতায় তিব্বতকে তার স্বার্থ বজায় রেখে Suzerainty মেনে নিতে রাজি করিয়ে সীমানা অধিকার ইত্যাদি নিয়ে খসড়া তৈরি হয় চীনা প্রতিনিধির অংশগ্রহণেই। কিন্তু শেষ অবধি চুক্তিতে স্বাক্ষর না করেই চীনা প্রতিনিধি চলে যায়। তিব্বত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রই থাকল, তিব্বত ব্রিটিশ অস্ত্র সাহায্যে চীনের দখলে থাকা কিছু অঞ্চল পুনরুদ্ধারও করে। এই অস্ত্র ছিল রডা কোম্পানির পিস্তল-সহ অস্ত্রাদি যার অংশবিশেষ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে চলে যায়— এ কথা সবাই জানে। ১৯৩০-এ ত্রয়োদশ লামার মৃত্যুর পর ১৯৪০ সালে চতুর্দশ দলাই লামার অভিষেকে চীন এক শক্তিশালী প্রতিনিধি দল লাসায় পাঠায় ত্রয়োদশ দলাই লামার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অছিলায়। সর্বাত্মক ভাবে চতুর্দশ দলাই লামার প্রতিষ্ঠার পর চীন তার প্রভুত্ব প্রদর্শন করতে দলাই লামার জন্য অনুমোদন পত্র পাঠায় অযাচিত ভাবে কৌশল হিসেবে। তখন তিব্বতের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির প্রমাণ, জাপানের বিরুদ্ধে চীন ও মিত্রশক্তির সৈন্য চলাচলের জন্য তিব্বতের অনুমোদন চাওয়া হয়। তিব্বত নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে সে অনুমতি দেয়নি। চীনের অধীনস্থ দেশ হলে এটা হোত কি?

১৯৪৪ সালে লাসায় প্রেরিত চিয়াং-কাইশেকের উপদেষ্টা শেন-ৎ-মুঙ লিয়েন তাঁর বইতে উল্লেখ করে গেছেন যে ১৯১১ সাল থেকেই তিব্বত কার্যত স্বাধীন। ১৯৫৯ সালে International Commis-

sion of Jurists তাদের প্রতিবেদন 'The Question of Tibet and the rule of law'-তে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,— 'Tibet's position on the expulsion of chinese in 1912 can be fairly described as one of defacto independence and there are as explaind strong legal groand for thinking that any form of legal subservience to china has banished. It is there fore submitted that the events of 1911-1912 mark the reemergence of Tibet as a fally Souerign state independent in fact in law of chinese control.' Richardson তাঁর Short History of Tibet/-এ তিব্বতের স্বাধীন অস্তিত্বের কথাই বলেছেন। চীন নির্লজ্জভাবে এসব আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রাহ্য করেছে এবং ততোধিক নির্লজ্জভাবে নিজের বাহবা কুড়োতে চীনের এই আগ্রাসনকে সমর্থন যুগিয়েছেন নেহরু। খ্যাতির ভিখারি নেহরু তিব্বতে ভারতের দীর্ঘকালীন স্বীকৃত কিছু অধিকার আছে— একথা নিবেদন করলে চীন জানিয়ে দেয়, 'The problem of Tibet remains a domestic problem of the peoples Republic of China and no foreign interference would be tolarated' জাতীয় স্বার্থরক্ষায় কীরকম দৃঢ়চিত্ত হতে হয় তার চৈনিক দৃষ্টান্ত দেখেও ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় 'তিব্বতে'র গুরুত্বকে বন্ধক দেওয়াতে নেহরুর বোধোদয় হয়নি। নিজের দেশ ভারত সম্পর্কে অপমানজনক কটুক্তিও তাকে বিচলিত করেনি এতটুকুও যখন পিকিং রেডিও বলে যাচ্ছে, 'British Imperialism and its running dog India, through their officially contributed publication have declered in union that Tibet never aeknowledge Chinese shzerainty over it. Nehru riding the imperialists, whose stooge he is actually consider himself the leader of Asian people.'

এই চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন নেহরু, কোরিয় যুদ্ধে চীনকে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে জেনারেল ম্যাক আর্থারকে ৩৮ সমান্তরাল অতিক্রম করায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষিত অনুমোদনকে বানচাল করে দিয়েছিলেন নেহরু এবং তার জন্য চৌ এন. লাইয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে আপ্লুত হয়েছিলেন তিনি। ম্যাকমোহন লাইনকে অতিক্রম করে ভারতীয় অঞ্চল দখল করতেই দুর্বলচিত্ত ও খ্যাতির ভিখারি নেহরুকে দিয়ে ভারতকে পঞ্চশীল চুক্তিতে বেঁধে ফেলে চীন নিত্য নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে এবং তা রূপায়ণ করতে একের পর এক ভারতীয় অঞ্চল দখল করতে থাকে। প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেই, কেবল তীব্র প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে গেছে বিদেশ দপ্তর। শেষ মুহূর্তে জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, স্বতন্ত্র দল নয়, গোটা দেশ খেপে যেতে, নেহরু অপ্রস্তুত অবস্থার সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পাঠিয়ে চরম অবমাননাকর পরাজয়ে ভারতের মুখ পুড়িয়েছিলেন। সভ্য যুক্তিযুক্ত পথে সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত চীনা অছিলার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় নিখুঁত কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল চীনা বিদেশ দপ্তরে। তার জবাব দিতে না পেরেই চৌ-এন-লাই এসেছিলেন ভারতে। ভারতীয় কাগজপত্র এড়িয়ে গিয়েই নেহরুকে আবার ফাঁদে ফেলার জন্য প্রস্তাব দেন--- লাডাক ছেড়ে দিলে মানসসরোবর-সহ নেফা অঞ্চল থেকে সরে যাবে চীন। আসলে কোনো অঞ্চলের জন্যই চীনা দাবি টেকে না বলে এই প্রস্তাব। নেহরু প্রায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। প্রবল ভাবে বাধা দিয়েছিলেন স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ— না, কোনো জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, উগ্র দক্ষিণপন্থী নয়। লাডাক থেকে সমগ্র নেফাকে তিনি চিনতেন হাতের তালুর মতো। চৌ-এন- লাইয়ের প্রস্তাবের সুদূরপ্রসারি সামরিক তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় কাগজপত্রে বেসামাল চৌ-এন-লাইয়ের কূট প্রস্তাব বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্ষিপ্ত চৌ এন লাই আবার অযৌক্তিক প্রস্তাব দিয়ে ফিরে গেয়েই ভারত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

শামসুল সাহেব যেন চীনের ব্রিফ নিয়ে বসে আছেন, তাঁর উপস্থাপন দেখে তাই মনে হয়। আসলে তা নয়, চীনের ব্রিফ নিয়ে অনেকেরই হয়তো অপেক্ষমান থাকার ব্যবস্থা হয়েছে! সাবধান হতে হবে দেশবাসীকে। শামসুল সাহেবের মতো আরও অনেকেই ক্ষিপ্ত, কারণ এতদিন ধরে এল এ সি-কে (লাইন অব অ্যাকটুয়াল কন্ট্রোল) ভারতের দিকে এগিয়ে আনা চলেছে নির্বিবাদে, এক-আধবার নয় লাডাকের কাছে চৈনিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রায় ৪০০ বার। কার্যত অনুপ্রবেশকে বৈধ করে ফেলেছে ভারতীয় নিষ্ক্রিয়তায়। পাকিস্তানে যখন তখন মাথা কেটে নিয়ে গেছে ভারতীয় জওয়ানদের রোজনামচার মতো, জওয়ানদের চোখ উপড়ে নিয়ে গেছে উৎসবের মেজাজে— সবই নিরুপদ্রবে হয়েছে। আজ হঠাৎ সার্জিক্যাল অপারেশন, চীনা অনুপ্রবেশের পাল্টা ব্যবস্থা। যেমন চলছিল তেমনই চলুক-পন্থীদের কাছে বিজেপি নেতৃত্বের ভূমিকা পছন্দ হচ্ছে না। শামসুল সাহেবের সুভাষিতাবলি : ...সঙ্ঘ উগ্র জাতিদম্ভের অনুশাসন মূলত তিনটি। এক, অখণ্ড সম্প্রসারণবাদী ভারত গড়ে তোলা, দুই, ভারতকে হিন্দুবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং তিন মুসলমান, খ্রিস্টান ও কমিউনিজমকে নির্মমভাবে দমন করা... শামসুল সাহেবের প্রবন্ধের শিরোনামের সঙ্গে এগুলি প্রাসঙ্গিক, অপরিহার্য? যাদের অভীপ্সা ও চক্রান্তে ভারত খণ্ড হয়েছে এবং হতে যাচ্ছে--- যাদের চক্রান্তমতো বিচ্ছিন্নবাদীদের হাতে চীনা-পাকিস্তানি অস্ত্রসম্ভার, যাদের সুবিধার্থে রাহুল গান্ধীর গোপনে চীনসংযোগ— তাদেরকে সম্যক ভাবে চিনুক দেশবাসী। কারণ দেশবাসীর এই সক্রিয় পঞ্চমবাহিনীকে চেনা খুবই জরুরি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

আদালতের বা সংসদের হস্তক্ষেপ ছাড়া রামমন্দির বিতর্কের অবসান অনিশ্চিত

ধর্মানন্দ দেব

আজ ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবার কাছে এক কৌতুহলের বিষয় রামমন্দির আবার কখন নির্মাণ হবে। সেই কৌতূহলের মাত্রা ইদানীং আরও বেড়ে যায় যখন ৭ বছর ধরে রামমন্দির নিয়ে মামলা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ঝুলে থাকার পর বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী মামলাটি দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। সুপ্রিমকোর্ট আবেদনটি পত্রপাঠ খারিজ করে পরামর্শ প্রদান করে আদালতের বাইরে বিতর্কটি মীমাংসা করার জন্য। প্রায় ১৫০ বছর ধরে ঝুলে থাকা বিতর্কটি এত সহজেই কি আদালতের বাইরে মীমাংসা হবে? যদি হোত তবে আগে কেন হলো না। তবুও আদালতের ওই রায়কে স্বাগত জানায় বিজেপি, সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। কিন্তু আদালতের পরামর্শকে নাকচ করে দেয় মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। এখন অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে বিতর্কের শুরু থেকে কিছুটা আলোচনা করা জরুরি।

মুঘল সম্রাট বাবর ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদিকে পাণিপথের যুদ্ধে হারিয়ে হিন্দুস্থানের মসনদ দখল করার পর ১৫২৮ সালে সেনাপতি মির বাকিকে হুকুম প্রদান করেন বাবরি মসজিদ তৈরি করার জন্য। আর এই মসজিদ তৈরি হওয়ার পর বিতর্কের সূত্রপাত হয় ১৮৫৩ সালে। কেননা অযোধ্যার নির্মোহী আখড়া দাবি করে রাম জন্মস্থানের সাবেক মন্দিরটি ভেঙে মসজিদ বানানো হয়েছে। সৃষ্টি হয় অশান্তির। সেজন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকেও এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। ১৮৫৯ সালে বিতর্কিত এলাকায় অস্থায়ী দেওয়াল তুলে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়। পরে বিষয়টি আদালতে যায়। প্রথম মন্দির নির্মাণের দাবিতে ১৮৮৫ সালে কোর্টে যান মহন্ত রঘুবীর দাস। তাঁর আবেদনে মসজিদের বাইরে একটি শামিয়ানা খাটানো ও মঞ্চ তৈরির কথা বলেন। অবশ্য আবেদনটি ফৈজাবাদ জেলা আদালত খারিজ করে দেয়। তারপর দেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর স্থানীয় হিন্দুরা ধাঁচার ভিতর রামলালার মূর্তি পান। তাই নির্মোহী আখড়ার সদস্যরা ওই স্থানকে রাম জন্মভূমি বলে উল্লেখ করে এলাকার মালিকানা দাবি করেন।

অন্যদিকে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড ঘটনাটি সাজানো বলে অভিহিত করে। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং ফৈজাবাদের কালেক্টর কে. কে. নায়ার। কালেক্টর নায়ার ধাঁচার সম্মুখভাগে থাকা লোহার দরজায় একটি তালা লাগিয়ে দেন এবং রামলালার পূজার জন্য একজন পুরোহিত নিযুক্ত করে দেন। পুরোহিত শুধু পূজা করার সময় ওই তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতেন। ভক্তরা কিন্তু বাইরে থেকেই রামলালার দর্শন করতেন।

১৯৫০ সালে গোপাল সিংহ বিশারদ ও মহন্ত পরমহংস রামচন্দ্র দাস ফের ফৈজাবাদ আদালতে রাম জন্মস্থানের উপরে প্রার্থনা করার আবেদন জানান। ফলে একটি জায়গা খুলে দেওয়া হয়। ১৯৫৯ সালে নির্মোহী আখড়া আদালতে আবেদন করে রাম জন্মভূমির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এবং কাস্টোডিয়ান তাদের হাতে দেওয়ার। উল্টোদিকে ওয়াকফের সুন্নি সেন্ট্রাল বোর্ড মসজিদে হিন্দু দেবতার মূর্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে আবেদন করে। পরে ১৯৮৪ সালে হিন্দুরা রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রধান ছিলেন বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি। শুরু হয় আন্দোলন এবং আন্দোলনের জন্যই বলা যায় হরিশঙ্কর দুবের আবেদনের ভিত্তিতে ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ফৈজাবাদের

জেলাশাসক এম. পাণ্ডে সাধারণ ভক্তদের জন্য মূল দরজার তালা খোলার নির্দেশ দেন। এতে মুসলমান মৌলবিরা তীব্র আপত্তি জানান। তারা পাল্টা গঠন করেন বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি। ১৯৮৯ সালে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় স্বামী দেবরাহা বাবার উপস্থিতিতে গ্রামে-গ্রামে শিলাপুজো হয় এবং প্রায় তিন লক্ষেরও বেশি শিলা পূজিত হয়ে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়া হয়। হরিশঙ্কর দুবের আবেদনের ভিত্তিতে জেলা আদালত নির্দেশে মসজিদের পাশের জমিতে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বিহারের হরিজন সমাজের শ্রীকামেশ্বর চৌপাল মন্দিরের শিলান্যাস করেন এবং বাবরি মসজিদকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে প্রাক্তন বিচারপতি দেবকী নন্দন আগরওয়াল যিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি আদালতের দ্বারস্থ হন এবং ফৈজাবাদ আদালতের সব মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হয়। বলতে গেলে তখন থেকেই বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের সূত্রপাত। যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন।

১৯৯০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে লালকৃষ্ণ আদবানী গুজরাটের সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত শুরু করেন রামমন্দির নির্মাণে জনজাগরণের জন্য রথযাত্রা। সবশেষে লক্ষাধিক রামভক্ত অযোধ্যায় এসে পৌঁছান এবং তাদের রোষানলে পড়ে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বাবরি ধাঁচা। ওই ঘটনার তদন্তের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও জাস্টিস লিবারনের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করেন। অন্যদিকে ২০০২ সালে হাইকোর্ট হিন্দুদের দাবি মেনে বিতর্কিত জায়গাটির প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাত হিন্দু নেতার বিরুদ্ধে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের মামলার ট্রায়ালের কথা বলা হয়। যদিও আদবানী উপ-প্রধানমন্ত্রী থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনা হয়নি। ২০০৪ সালে উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশ আদালত রায় দেয় আদবানীর নাম রাখতে হবে বলে। ২০০৯ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া তাদের সার্ভে রিপোর্ট জমা দিয়ে আদালতকে জানায় বিতর্কিত স্থানে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের তিন বিচারপতি যথাক্রমে সুধীর আগরওয়াল, এস ইউ খান এবং ধরমবীর শর্মা মামলার রায় প্রদান করে বলেন, অযোধ্যার ২.৭৭ একর জমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। রামলালা ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি যেখানে আছে সেটা মন্দির হিসেবেই থাকবে। বাইরে থাকা 'রাম চবুতরা', 'সীতা রসোই' এবং 'ভাণ্ডার' থাকবে নির্মোহী আখড়ার হাতে এবং এক তৃতীয়াংশ পাবে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। এই রায়ের বিরুদ্ধেই আপিল মামলা হয় সুপ্রিমকোর্টে। আপিল করে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। ২০১১ সালে সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্টের সেই রায়কে স্থগিতাদেশ দেয়। দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বহু আলোচিত তথা বিতর্কিত বিষয়ের এখনো সুরাহা হচ্ছে না। আদৌ সুপ্রিমকোর্ট এই বিতর্কের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে পারবে কী? তাই আজ সুপ্রিমকোর্ট বলছে আদালতের বাইরে বিষয়টি মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সকলের জানা উভয় পক্ষ আলোচনায় রাজি না হলে আলোচনা কখনো ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে না।

অন্যদিকে সিবিআইয়ের আবেদন মেনে আদবানী-সহ বাকিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চার্জ গঠনের পরামর্শ দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত। মামলার জল কতদূর গড়াবে তা বলা মুশকিল। তবে আদালত বা সংসদ ছাড়া এই বিবাদের মীমাংসা অসম্ভব। শীঘ্রই রামমন্দির নির্মাণ করতে হলে আদালত-নির্ভর না হয়ে সংসদে প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে। ঠিক যেভাবে সোমনাথ মন্দির নির্মাণের বেলায় হয়েছিল। এটাই সবচাইতে সহজ পন্থা। সেই সময়ও বিল নিয়ে সরকার পক্ষের মধ্যে মতান্তর ছিল, যেমন প্রধানমন্ত্রী নেহরু রাজি ছিলেন না কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির উদ্যোগেই বলা যায় সোমনাথ মন্দির নির্মাণের বিলটি সংসদে পাশ হয়েছিল। রাম মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও সংসদে আইন প্রণয়ন হওয়া উচিত। সেজন্য সরকার পক্ষের কাউকে এগিয়ে আসতে হবে। এখন কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি দল, যে দলের প্রতিটি নির্বাচনী ইস্তাহার বা ঘোষণাপত্রে রামমন্দির নির্মাণের কথা রয়েছে। সেই বিজেপিকেই এখন সাংবিধানিকভাবে ঘোষণাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে।

(নিবন্ধকার পেশায় আইনজীবী)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SWASTIKA**
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

ম্যাগনা কারটা ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্র

প্রণব দত্ত মজুমদার

আজকাল টিভিতে, খবরের কাগজে Liberty, Freedom of expression, Human Right ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত ঘটনাবলী নিয়ে জোর তর্ক বিতর্ক চলছে। জে এন ইউ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কিছু ছাত্র ভারতবর্ষকে টুকরো করার, কাশ্মীর, মণিপুরকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার স্লোগান দিচ্ছে। ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট আক্রমণকারী আফজল গুরুর ফাঁসির নিন্দা করে স্লোগান দিচ্ছে। এগুলো নাকি Freedom of expression। কাশ্মীরে জিহাদিদের প্ররোচনায় অল্পবয়সী ছেলেরা পুলিশ, মিলিটারিদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছে। কিন্তু পুলিশ মিলিটারি অ্যাকশন নিলেই একধরনের রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী হই হই করে উঠছেন, এতে নাকি Human Right লঙ্ঘিত হচ্ছে। Liberty, Freedom of expression, Human Right এগুলো ভারতীয় জনগণের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার এবং এসব রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন NGO সংস্থা সারা দেশে ছোটাছুটি করছে। আপনার লিবার্টি কতটা থাকবে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার মাত্রা কতদূর পর্যন্ত হবে, আপনার Human Right অন্যকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে কিনা ইত্যাদি তর্কসাপেক্ষ। যারা দেশ পরিচালনা করবেন তাঁরা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, নিরাপত্তার বিষয় মাথায় রেখে এইসব অধিকারের সীমা নির্ধারণ করবেন। সেইসব চুলচেরা বিশ্লেষণে যাচ্ছি না।

দেশ পরিচালনার নিরিখে আধুনিক বিশ্বের দেশগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়— ইউনাইটেড কিংডম, ইউরোপিয়ান দেশসমূহ, ইউনাইটেড স্টেটস, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান এবং অবশ্যই ভারত— এই সমস্ত দেশ পরিচালিত হয় Rule of Law/Rule of the Land মান্য করে এবং সেই Rule of the Land সেই দেশের মানুষের দ্বারা তৈরি এবং তা শাসক বা শাসিত সবার জন্যই সমান, শাসক আইনের ঊর্ধ্বে নন; এবং এইসমস্ত দেশের নাগরিকরা Liberty, Freedom of expression, Human Rights ইত্যাদি বেশ ভালরকম ভাবেই উপভোগ করেন। আরেক ধরনের দেশ আছে যেমন--- কিউবা, সৌদি আরবিয়া, রাশিয়া, নর্থ কোরিয়া, চীন ইত্যাদি এবং অধিকাংশ ইসলামিক রাষ্ট্র— এই সমস্ত দেশে কিন্তু নাগরিকেরা প্রথমোক্ত দেশের মতো Liberty, Freedom of expression ইত্যাদি এত অবাধ ভাবে উপভোগ করতে পারে না; এবং এই সমস্ত দেশে শাসক আইনের ঊর্ধ্বে, শাসক ও শাসিত একই আইনের আওতায় আসেন না।

আধুনিক সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা— যেখানে মানুষের Liberty থাকবে, freedon of expression থাকবে, Human Right রক্ষিত হবে, যেখানে শাসক এবং শাসিত সবাই একই Rule of Law-র অধীনতা স্বীকার করবেন এবং সেইসব Rule of Law সেই দেশের জনগণ (জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে) তৈরি করবেন— রাষ্ট্র পরিচালনার এই আধুনিক ধারণাটি এসেছে ৮০০ বছর আগের একটি এগ্রিমেন্ট 'ম্যাগনা কারটা' বা 'দি গ্রেট চার্টার' থেকে।

আগে বিশ্বের সর্বত্রই রাজা, বাদশা, সম্রাটরা দেশ শাসন করতেন। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি ঘোষণা করতেন এবং বংশ পরম্পরায় দেশ শাসন করতেন। প্রজারাও তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মান্য করতেন এবং তাঁর শাসন ভাল না লাগলেও ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভেবে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতেন। বিশেষত ইউরোপে প্রজারা মনে করতেন— রাজা যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি তিনি ভুল করতে পারেন না— King can do no wrong। এই ভাবে রাজা-রানি, সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, বাদশা-বেগমরা Doctrine of Divine Rule চালাতেন নিজেদের খেয়ালখুশি মতো। তাদের সুবিধা মতো তাঁদের ইচ্ছানুসারে আইন তৈরি হোত এবং তা এক-একজনের ক্ষেত্রে এক-একরকম হোত; অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে Rule of Law/Rule of the Land বলে কিছু ছিল না। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এই রাজতান্ত্রিক পরম্পরায় যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এল। ৮০০ বছর আগে, ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে তখন King John-এর শাসন চলছে। রাজার অপশাসনে রাজ্যের অভিজাত Baron-রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। অবশেষে রাজা বাধ্য হলেন তাঁর কিছু আইনকানুন সংশোধন করতে। চার্চের অধিকার রক্ষা, ব্যারনদের নিরাপত্তার অধিকার, বিনাবিচারে ব্যারনদের কারাগারে বন্দি করে রাখা যাবে না সে ব্যাপারে কানুন, দ্রুত যাতে বিচার পাওয়া যায় তার কানুন, রাজাকে যে রাজকর দিতে হয় তার পরিমাণ নির্ধারণ করার নির্দিষ্ট কানুন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে একটি Charter তৈরি করা হয়। Charter-এর ড্রাফট তৈরি করেন the Archbishop of Canterbury। ১২১৫ সালের ১৫ জুন ইংল্যান্ডের রাজা John-এর সঙ্গে বিদ্রোহী Baron-দের এক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং রাজা তাঁদের অধিকার সংবলিত চার্টার মেনে নেন। এই চার্টারটির

দেশভক্তির আবেগ সঞ্চার করে নাগরিকদের মধ্যে যদি দেশের প্রতি ভালবাসা তৈরি করা যায়, তাঁদের মধ্যে যদি জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় তাহলে দেশের উপকারই হবে।

নাম— 'Magna Carta Libertatum'— এটি ল্যাটিন শব্দ, ইংরেজি করলে দাঁড়ায়— The Great Charter of Liberties। সংক্ষেপে Magna Carta। বলা চলে রাজা-রানিরা Doctrine of Divine Right-এর নামে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো আইন তৈরি করে প্রজাশাসনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন সেই জায়গায় জনগণের জন্য জনগণের তৈরি Rule of Law/Rule of the Land প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'Magna Carta' যেন এক আলোকবর্তিকা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজার আমলে এতে অনেক পরিবর্তন সংশোধন ইত্যাদি হয়েছে। ইউরোপের রাজনৈতিক জীবনে 'Magna Carta'-র প্রভাব অপরিসীম। রাজাদের Doctrine of Divine Right-কে challenge করবার সময় বিরোধীরা 'Magna Carta'-কে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতেন; এটি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরির ক্ষেত্রে প্রেরণা জুগিয়েছে। গণতন্ত্রপ্রেমী মুক্তবিশ্বে আজ যে মানুষের বিভিন্ন অধিকারের কথা বলা হয় তার প্রেরণা জুগিয়েছে এই 'Magna Carta'। ১৭৮৭ সালে American Constitution তৈরির সময় ওখানকার রাষ্ট্রনায়কেরা 'Magna Carta'-র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'Magna Carta'-র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিচারক Lord Denning বলেছেন— ''The greater constitutional document of all times– the foundation of the freedom of the individual against the arbitrary authority of the despot.' ২০১৫ সালে 'Magna Carta'-র ৮০০ বছর পূর্তিতে যে Commemoration Committee হয় তার চেয়ারম্যান Sir Robert Worcester লেখেন— 'The principles contained in Magna Carta now affect the lives of nearly two billion people in more than 100 countries. It is an exceptional documents on which all democratic societies have been construted.'

ইংরেজ আসার আগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ রাজা, বাদশা, সুলতানদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। ইংরেজ এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর শাসন প্রবর্তিত হয়। ইউরোপের নবজাগরণের হাওয়া ভারতবর্ষে আসে। রাজা বাদশাদের খেয়ালি আইন কানুনের বদলে এদেশে আসে Rule of Law। এদেশ থেকে মেধাবী ছাত্ররা ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে গিয়ে ইউরোপের নবজাগরণের প্রভাবে ওখানকার মুক্ত চিন্তা, মুক্ত ভাবনায় প্রভাবিত হলেন, Liberty-র ধারণা তাঁদের হাত ধরে ভারতবর্ষে এল। স্বাধীনতার স্পৃহা জাগল তাঁদের মনে। ইংরেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অবশেষে ইংরেজদের এদেশ থেকে রাজ্যপাট ছেড়ে যেতে বাধ্য করলেন ভারতবর্ষের মেধাবী লড়াকু নেতারা। অবশেষে ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এল তখন এদেশের মেধাবী রাষ্ট্রনায়কেরা ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান অধ্যয়ন করে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করেন। সেই অর্থে ভারতীয় সংবিধানের প্রেরণা Magna Carta। জনগণের জন্য বিভিন্ন ধরনের Liberty ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় যেমন— Article-14 (equality before Law), Article-19 (freedom of speech and assembly), Article-21 (right to life and liberty) Article-300A (right to property) ইত্যাদি।

আমাদের দেশের সংবিধানের Preamble এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। Preamble বলছে— We, The People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all citizens :

JUSTICE–social, economic and political ; LIBERTY–of thought, expression, belief, faith and worship ;

EQUALITY–of status and opportunity ; and to promote among them all ;

FRATERNITY, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation ; In Our constituent Assembly this twenty-sixth day of November 1949, do Hereby Adopt, Enact and give to ourselves this constitution.

বিভিন্ন ধারা উপধারা সংবলিত আমাদের সংবিধান পৃথিবীর দীর্ঘতম সংবিধান। তবুও কি আমাদের দেশ খুব ভালভাবে চলছে? রাজতন্ত্র সরে গিয়ে সাধারণতন্ত্র চালু হয়েছে। আগে রাজা বাদশরা বংশ পরম্পরায় রাজত্ব করতেন অর্থাৎ তাঁদের Dynasty-র শাসন চলতো। এখনো কি অন্য রূপে বিভিন্ন Dynasty-র শাসন চলছে না আমাদের দেশে? আমরা নাগরিকেরা কেউ কেউ বিভিন্ন অধিকারের অপপ্রয়োগ করছি, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন অধিকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। ভারতীয় গণতন্ত্রের যে তিনটি স্তম্ভ— Legislature, Judiciary এবং Executive তাঁরা সবাই কি সঠিক ভূমিকা পালন করছে? আসলে সংবিধান একটি প্রাণহীন কেতাব। এর প্রাণ সঞ্চার হবে যদি শাসক ও শাসিত সবাই সততার সঙ্গে সঠিক ভূমিকা পালন করি। আসলে দেশের প্রতি আমাদের সবাইকেই দায়বদ্ধ হতে হবে। দেশের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের গভীর ভালবাসা থাকলে তবে সেই দায়বদ্ধতা আসবে। মায়ের প্রতি সন্তানের গভীর ভালোবাসা থাকে। সেই ভাব জাগরুক করার জন্যই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা রূপে গ্রহণ করে তাঁর বন্দনায় লিখেছিলেন 'বন্দে মাতরম্'; আর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঁকলেন ভারতমাতার চিত্রকল্প। এসবের মাধ্যমে দেশভক্তির আবেগ সঞ্চার করে নাগরিকদের মধ্যে যদি দেশের প্রতি ভালবাসা তৈরি করা যায়, তাঁদের মধ্যে যদি জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় তাহলে দেশের উপকারই হবে। কিন্তু এক ধরনের রাজনৈতিক নেতা এবং এক ধরনের ধান্দাবাজ বুদ্ধিজীবী এর মধ্যে অন্য মানে খোঁজার চেষ্টায় মেতে আছেন। এঁদের বিচ্ছিন্ন করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তথ্য সূত্র : ১. Jihadist Threat to India–by Tufail Ahmad. ২. Magna Carta–Wikipedia.

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

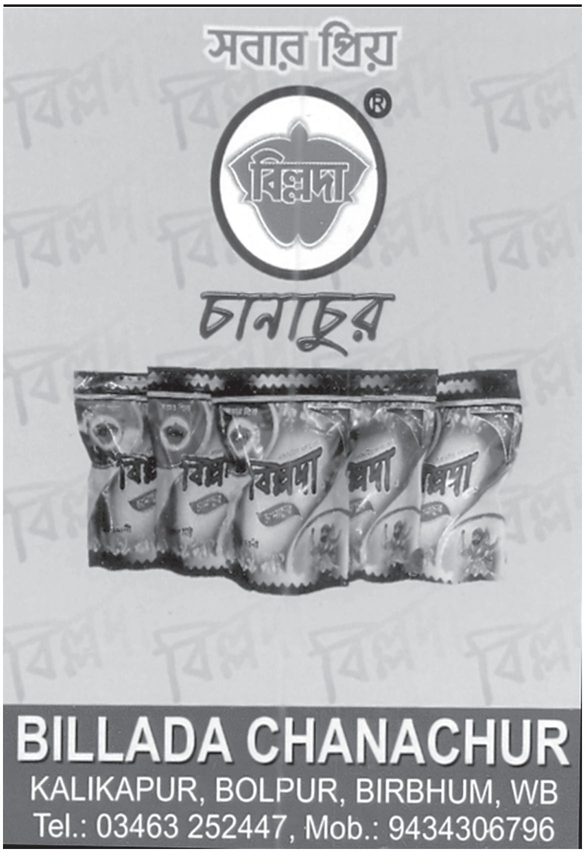

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

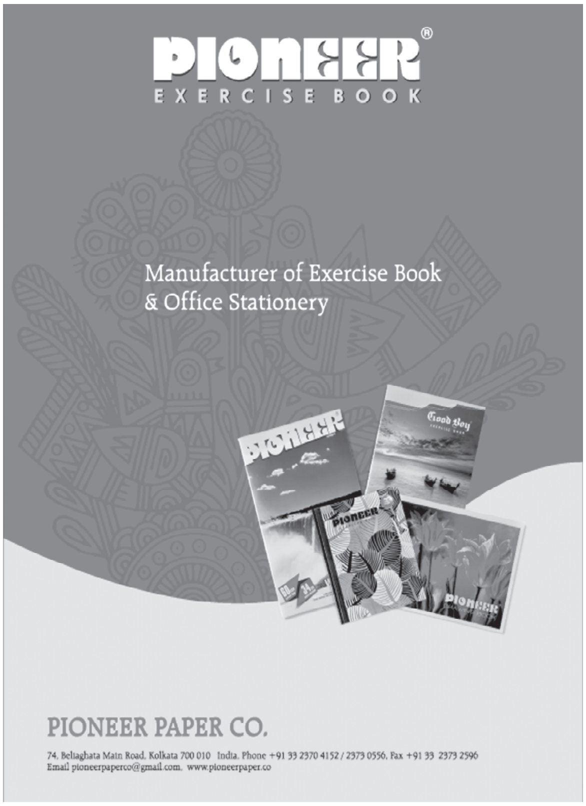

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি রক্তের মধ্যেই হিংসা

রাকেশ সিনহা

কেরলের ধারাবাহিক রাজনৈতিক হিংসার ঘটনাকে শুধুমাত্র মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়নায় দেখলে তার প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা যাবে না। ভারতের মতো বিশাল দেশ যেখানে বহুল পরিমাণে মতাদর্শগত বিবিধতা বিদ্যমান, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো অস্বাভাবিক ও কঠিন কথা নয়। কেরলের জনসমাজ আধ্যাত্মিকতা ও প্রগতিশীলতার জন্য সুপরিচিত। সেবা ভাবের জন্যও তাদের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, তবু কেন রাজনৈতিক হিংসা থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না? এর মূল কারণ সন্ধান করতে হবে।

ইতিহাস সাক্ষী, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএম) যেখানে শক্তিশালী এবং ক্ষমতা কায়েম করেছে সেখানে অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাস চরম আকার ধারণ করে। এই দলটি ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া ভেঙে তৈরি হয়েছে। তখন থেকে আজ অবধি এই দলটি ঘোর সুযোগসন্ধানী ও সন্ত্রাসের রাজনীতি করে চলেছে। এরা মুখে লোকদেখানো সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা যতই বলুক না কেন, এদের অবস্থা সেই মার্কসবাদীদের মতো, যাদের অমানবিক ও আগ্রাসী আচরণের জন্য বিশ্বে বহু আগেই পরিত্যাক্ত হয়েছে। খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ২০তম কংগ্রেসে (১৮৫৬) স্ট্যালিনের জঘন্য নিষ্ঠুরতার ঘোর সমালোচনা করে। সিপিএম কিন্তু এরকম মনে করে না, তারা স্ট্যালিনকে মহামানব মনে করে। স্ট্যালিনের চরম নিষ্ঠুরতার প্রমাণ হলো, ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির নির্বাচিত ১৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ৯৮ জনকে হত্যা করা হয়। কারণ তাঁরা স্ট্যালিনের অন্ধভক্ত ছিলেন না। সিপিআই-এর চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে

> **‘ঈশ্বরের আপন দেশ’ কেরলে শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক হত্যার ইতিহাস বহু পুরনো। সিপিএমের এই দুর্গে আর এস এস, বিজেপি, কংগ্রেস, মুসলিম লিগ-সহ যারা সেখানে মাথা তোলার চেষ্টা করেছে, তাদের কার্যকর্তাদের ওপর মৃত্যুর খাঁড়া নেমে এসেছে।**

যা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। তাঁর মতে, 'সিপিএম ভিন্ন মতাদর্শের সংগঠন যারা মানুষের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীর মতো ব্যবহার করে থাকে। তারা নিজেদের সবচাইতে খাঁটি ও সুপারম্যান মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে তারা অত্যন্ত সংকীর্ণতার সঙ্গে পলিটিক্যাল মার্ডার করে থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'এটাই ওদের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস।' ডাঙ্গের এই বক্তব্য ছিল ১৯৭০ সালে ইন্সটিটিউট অব সোশ্যালিস্ট স্টাডি-তে এক ভাষণে। এদের অসুহিষ্ণুতা এমনই যে, ভাষণের অব্যবহিত পরেই সিপিএমের এক নেতা ডাঙ্গেকে ধন্যবাদ জানালে তৎকালীন সিপিএমের জেনারেল সেক্রেটারি পি সুন্দরাইয়া তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করেন।

কেরলে সিপিএম যখন ক্ষমতায় বা ক্ষমতার কাছাকাছি আসে তখন তারা তাদের প্রকৃতি অনুসারেই তাদের মতাদর্শের বিরোধীদের প্রতি সন্ত্রাস চালাতে থাকে। এদের সন্ত্রাসের শিকার শুধু সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নয়, অনেক কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং সিপিএমের নেতাও আছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কেরলে গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে কাজ করে চলেছে। ছয়ের দশকে সিপিএম সঙ্ঘের ওপর একটু-আধটু হামলা শুরু করে। কিন্তু সঙ্ঘের যখন জনপ্রিয়তা শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সালে জনসঙ্ঘের অধিবেশন কালিকটে হয়, তখন সিপিএম এই জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আটকানোর জন্য প্রথম সন্ত্রাস শুরু করে। এই অধিবেশনে পণ্ডিত দীনদয়ালের বক্তব্যে সিপিএম ভয় পেয়ে যায়। দীনদয়ালজীর বক্তব্য ছিল, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব নিতে হবে এবং সামাজিক-আর্থিক সমতার জন্য লড়াই করতে হবে। মাটি হারানোর ভয়ে সিপিএম দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং হত্যার রাজনীতি শুরু করে। প্রথম ওয়াড়িকল রামকৃষ্ণনকে তারা হত্যা করে। তিনি বড় ব্যবসায়ী ছিলেন না। সামান্য একজন মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক (ময়রা) ছিলেন। যে দু'জন এই হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের

"সিপিএম গুণ্ডার হাতে মৃত অধিকাংশই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা। এই হত্যার কলঙ্ক চাপা দিতে সিপিএম নেতৃত্ব নিজেরাও আক্রান্ত বলে দাবি করে। সম্প্রতি সীতারাম ইয়েচুরি দাবি করেছেন যে, আর এস এসের আক্রমণে তাঁর দলের ১৩ জন মারা গিয়েছে। কিন্তু কেরল পুলিশের রিপোর্টে ইয়েচুরির দাবির সমর্থন করে না।"

একজন পি বিজয়ন বর্তমানে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী, অন্যজন কোদিয়েরী বালকৃষ্ণান বর্তমানে স্টেট সেক্রেটারি। এদের ওপর কি বিশ্বাস রাখা যায়, এরা দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যে হত্যার রাজনীতি বন্ধ করবেন বা ক্যাডারদের সন্ত্রাস বন্ধ করতে বলবেন? এজন্য এদের লোকদেখানো আশ্বাসের পরও হত্যার রাজনীতি থামছে না। নাম ও পরিসংখ্যান দিয়ে এখন কোনো লাভ নেই। মোদ্দা কথা, এই হত্যার রাজনীতি বন্ধ করতে এখন এদের বাধ্য করতে হবে।

সিপিএমের লাগাতার এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে মানসিকতা রয়েছে তা তালিবানদের থেকে কোনোভাবেই আলাদা নয়। রাজনৈতিক বিরোধীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা, দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলা— সর্বপ্রকারে এরা তালিবান শ্রেণীভুক্ত। সবচেয়ে তাজা উদাহরণ হলো, রাজেশের হত্যা। তাঁর শরীরে ৮০-রও বেশিবার চাকু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে আর দুই হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ১৯৯৯-এ সঙ্ঘের কার্যকর্তা জয়কৃষ্ণন যখন তাঁর ক্লাস সিক্সেপড়া মেয়েকে বাড়িতে পড়াচ্ছিলেন তখন তাঁকে এরকমই নৃশংসভাবে হত্যা করে সিপিএম ক্যাডাররা। এর প্রভাব সেই নিষ্পাপ শিশুটির ওপর কীভাবে পড়েছিল তা কল্পনা করা যাবে না।

কেরলের এই হত্যাকাণ্ড স্থানীয় পার্টির ব্যাপার মনে করা অন্যায় হবে। পার্টির নীতিনির্ধারক সমিতি অর্থাৎ পলিটব্যুরো এর থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তাদের ১৬ সদস্যের মধ্যে ৬ জন কেরলের। এটা কী করে সম্ভব যে, রাজনৈতিক বিরোধীদের অথবা তাদের পার্টিরই অসন্তুষ্টদের হত্যা পলিটব্যুরোর অজান্তেই করা হচ্ছে? সিপিএমের কীরকম অনুশাসন— যারা জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়া আটকায়, সীতারাম ইয়েচুরিকে রাজ্যসভায় যেতে আটকায় এবং কেরলের বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় সিপিএম নেতা অচ্যুতানন্দনকে কোণঠাসা করে দেয়! সেই পলিটব্যুরো কন্নুর ও তিরুবনন্তপুরমে নিজেদের নেতার হত্যা ঠেকাতে পারে না? ■

বাম-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সঙ্ঘের ঐতিহাসিক প্রতিবাদ

সন্দীপ চক্রবর্তী

সন্ত্রাস এবং বামপন্থা একে অপরের পরিপূরক। গণতন্ত্র হোক বা জাতি-সম্পর্কিত ধারণা— বামপন্থীরা কোনওটাই বিশ্বাস করে না। বাম আদর্শ অনুযায়ী, সংবিধান একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র বিশেষ এবং তাদের দল ও দলতন্ত্র এইসব যান্ত্রিকতার উর্ধ্বে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ভারতের অন্যতম প্রধান বামপন্থী দল সিপিএম কেরলে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নির্বাচনী রাজনীতিতে এমন সুপরিকল্পিত সন্ত্রাসের নিদর্শন বড়ো একটা মেলে না। যদিও, এত কিছুর পরেও বামপন্থী দলগুলি শান্তির প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়, নেতারা মত প্রকাশের স্বাধীনতার উদ্‌গাতা হিসেবে নিজেদের তুলে ধরেন। সম্প্রতি ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি এই মিথ ভাঙার জন্য দেশজুড়ে এক প্রতিবাদ-আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। তাই লক্ষ কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জনে আপাতত গর্তে ঠাঁই নিয়েছে হার্মাদেরা।

কয়েক মাস আগে জাতীয়তাবাদী সংগঠন ফোরাম এগেইনস্ট কমিউনিস্ট টেররিজম (এফএসিটি) কেরলে রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর সিপিএমের লাগাতার অত্যাচার এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের হত্যা করার প্রতিবাদে দেশজুড়ে সমাবেশের ডাক দিয়েছিল। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। প্রতিবাদীদের দাবি, কেরলে সঙ্ঘ এবং বিজেপি কার্যকর্তাদের ওপর সিপিএমের অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ হোক এবং সিপিএমের যেসব গুণ্ডার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মামলা চলছে তাদের রাজনীতির রং না দেখে পিনারাই বিজয়ন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিন। উল্লেখ্য, বাম-গণতান্ত্রিক সরকার কেরলের মসনদে বসার মাত্র এক বছরের মধ্যে সঙ্ঘ এবং বিজেপির ১১ জন কার্যকর্তা খুন হয়েছেন।

নাগপুর :

কেরলে সরকার সমর্থিত সিপিএমের গুণ্ডাদের হত্যার রাজনীতির প্রতিবাদে এখানকার সংবিধান স্কোয়ারে (আরবিআই স্কোয়ার) এক মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের দায়িত্ব ছিল লোকাধিকার মঞ্চের। মিছিলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মানুষ শামিল হন। প্রারম্ভিক ভাষণে বিজেপির কেরল শাখার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ভি. মুরলীধরন হিন্দু সংগঠনগুলির কার্যকর্তাদের ওপর সিপিএমের গুণ্ডাদের নৃশংস অত্যাচারের নিদর্শন তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর-কার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী তাঁর ভাষণে বলেন, 'কমিউনিস্ট আদর্শের জন্ম যেসব দেশে সেখানেই এই তত্ত্ব এখন অচল। রাশিয়া বা চীন কেউই এখন কমিউনিস্ট নয়। আমাদের দেশে দুটি রাজ্যে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আছে। কিন্তু তাই বলে তারা জোর করে তাদের মতাদর্শ অনিচ্ছুক মানুষদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমরা কেরল সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলিকে কেরলে কাজ করতে দিন।'

ভাইয়াজী আরও বলেন, 'গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের মত প্রকাশের অধিকার আছে। সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া অগণতান্ত্রিক। প্রাচীনকাল থেকে কেরল ভারতের অন্যতম পবিত্র ভূমি হিসেবে স্বীকৃত। কারণ কেরল আদি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান। কিন্তু সিপিএমের অশিষ্টাচারের ফলে সেই পবিত্রতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। একই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গেরও। অসংখ্য স্বয়ংসেবক কেরলে সিপিএমের হাতে খুন হয়েছেন। অকালে যেসব প্রাণ ঝরে গেল তাদের ঐহিক কোনও চাহিদা ছিল না। তাঁরা শুধু দেশের কাজ করতে চেয়েছিলেন। সব থেকে বড়ো কথা, সিপিএমের জিঘাংসা হত্যাতেই যে ফুরিয়ে যায়, তা নয়। ওরা মহিলাদের আক্রমণ করে, শিশুদেরও ছাড়ে না। সম্পত্তি ধ্বংসের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ওদের নৃশংসতা গত কয়েক মাসে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে।'

কর্ণাটক :

কেরলের সিপিএম পোষিত গুণ্ডাদের

অত্যাচারের প্রতিবাদে কর্ণাটকের মানুষ পথে নেমেছিলেন। তারা বেঙ্গালুরুর ঐতিহ্যমণ্ডিত টাউন হলে মিলিত হন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিজেপি এবং সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিএস ইয়েদ্দিউরাপ্পা বলেন যে, একের পর এক কার্যকর্তাকে খুন করে সিপিএম বিজেপি এবং সঙ্ঘের শেকড়ে আঘাত করতে চাইছে কিন্তু বিজেপি এসব তুচ্ছ করে স্বমহিমায় ফিরে আসবে। তাঁর নিজের ভাষায়, 'মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের প্ররোচনায় সিপিএম কেরলের বিজেপি নেতা-কর্মীদের হত্যা করতে চাইছে। এই প্রবণতা আজ নতুন নয়, স্বাধীনতার পর থেকেই এটা সিপিএমের ঘোষিত নীতি। আমরা কোনওদিনই সিপিএমের খুনখারাবির রাজনীতিকে ভয় করিনি। শীঘ্রই কেরলে আমরা সিপিএম-শাসনের শেষ দেখে ছাড়ব।' সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় সঙ্ঘচালক ভি. নাগরাজ, দিল্লির বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষী লেখি প্রমুখ।

তামিলনাড়ু :

কেরলে সিপিএমের অত্যাচারের প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন উত্তর তামিলনাড়ুর ১৩টি জেলা থেকে আসা প্রায় ৫০০০ মানুষ। এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল ফোরাম এগেইনস্ট কমিউনিস্ট টেররিজম (এফ এ সি টি)। চেন্নাইয়ের ভাল্লুভার কোট্টামে আয়োজিত এই সভায় জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির একাধিক নেতা অংশ নেন এবং সিপিএম-সহ বামদলগুলির অমানবিক ও বর্বরোচিত রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি তামিঝিসাই সুন্দর রাজন বলেন, 'গুজব ছড়ানো হচ্ছে সঙ্ঘ এবং বিজেপির কার্যকর্তারা নাকি কমিউনিস্টদের হত্যা করার চেষ্টা করছে। প্রকৃত সত্য যদিও এর থেকে একেবারেই উল্টো। সঙ্ঘ রক্ত নেওয়ায় বিশ্বাস করে না, দেওয়ায় করে।' তিনি অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধ করার দাবি করেন।

হিন্দু মুন্নানির ইয়াক্কামের কার্তিকেয়ন বলেন, 'চীন তার নিজের দেশের নাগরিকদের প্রতি কতটা অসহিষ্ণু আচরণ করতে পারে জানলে পরে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। শিল্পায়নের নামে চীন কীরকম জোর করে অনিচ্ছুক নাগরিকদের কাছ থেকে জমি আদায় করেছিল, একথা অনেকেই জানেন। চীনে মেয়েদের অধিকার এবং চাষিদের অবস্থা মোটেই সুরক্ষিত নয়।' আর এক বক্তা এলানগোভান বলেন, কমিউনিস্টদের হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে আমাদের সকলের সোচ্চার হওয়া দরকার। কেরল আর ত্রিপুরায় ছাড়া সারা বিশ্বে আর কোথাও কমিউনিস্টরা নেই। এই দুটি রাজ্যে কমিউনিস্টদের কর্মসূচি একটাই, বিরোধীদের নিকেশ করে নিজের রাস্তা সাফ করো। ওরা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না কিন্তু হুন্ডির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুট করে।'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর তামিলনাড়ুর প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ প্রকাশ বলেন, 'কমিউনিস্টরা হিংসায় বিশ্বাস করে কিন্তু সঙ্ঘের বিশ্বাস প্রেমে, গুরুজী এমনটাই চাইতেন। সঙ্ঘ জনপ্রিয় কারণ আমরা কখনও হিংসা করি না, ভালোবেসে সকলকে কাছে টেনে নিই। সঙ্ঘের শক্তি অনেকটা দাবানলের মতো, যা কেবল ছড়িয়ে পড়তে জানে। নীতিগত ভাবে কমিউনিজম এবং মার্কসইজম তাদের আয়ুর শেষপাদে পৌঁছে গেছে।'

মুম্বই :

সিপিএমের দাদাগিরির প্রতিবাদ জানাতে রাজনীতিবিদ, ছাত্র, ডাক্তার, শিল্পপতি থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তরের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে। এখানেও উদ্যোক্তা সেই ফোরাম এগেইনস্ট কমিউনিস্ট টেররিজম। সভা শুরু হয় বেলা এগারোটার সময়।

কেরলের কন্নুর জেলায় সঙ্ঘ ও বিজেপি কর্মীদের ওপর সিপিএমের লাগাতার অত্যাচার এবং খুনখারাপির কথা ওঠা মাত্র উপস্থিত

জনতা বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত করে তোলেন। অন্যতম বক্তা বিজেপি বিধায়ক অতুল ভাটখালকর বলেন যে, কেরলে শাসক সিপিএম সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের ওপর লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এর শেষ হওয়া দরকার। কেরলে শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য ফোরাম এগেইনস্ট কমিউনিস্ট টেররিজমের সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে দেবার জন্য আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল অব পুলিশ প্রবীণ দীক্ষিত, প্রখ্যাত মনোবিদ হরিশ শেঠি প্রমুখ। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদও এই প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়েছিল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে রতন সারদা বলেন, 'সিপিএম এবং অন্য বামদলগুলির সন্ত্রাস জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যেই এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে।'

গোয়া :

ক্ষমতায় এসে সিপিএম ইসলামিক স্টেট-সহ কেরলের একাধিক জিহাদি গোষ্ঠীর সুবিধে করে দিচ্ছে। কেরলে সিপিএমের গুণ্ডাগিরির প্রতিবাদে গোয়ায় আয়োজিত সভায় এসে এরকম অভিযোগ করেছে গোয়া জনাধিকার সমিতি। রাষ্ট্রপতিকে দেওয়ার জন্য লিখিত একটি স্মারকলিপিতে তারা অভিযোগ করেছেন, 'এটা আর কোনও গোপন কথা নয় যে কেরলে সঙ্ঘকে আটকানোর জন্য সিপিএম এবং কয়েকটি ইসলামিক জিহাদি গোষ্ঠী রীতিমতো আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। কন্নুরের কনকমালা পাহাড় থেকে আই এস জিহাদিদের গ্রেপ্তার হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামি মৌলবাদের বেড়ে ওঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট-প্রধান রাজ্যগুলো।' স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, 'কনকমালা পাহাড়ের আশেপাশের অঞ্চলে সিপিএমের প্রাধান্য রয়েছে। ওরা যদি মৌলবাদের বিরোধী হোত তাহলে কনকমালা পাহাড়ে জঙ্গিরা আশ্রয় পেত না। একথা সবাই জানে জিহাদিদের সাহায্যেই সিপিএম কেরলে ক্ষমতায় এসেছে।' রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে দেওয়ার জন্য স্মারকলিপিটি গোয়ার রাজ্যপাল মৃদুলা সিনহার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর :

কেরলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শহিদদের স্মৃতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। জম্মুতে তাউই সেতুর কাছে প্রাক্তন প্রশাসক মহারাজা হরি সিংহের মূর্তির পাদদেশে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন প্রতিবাদীরা। নেতৃত্ব দেন নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক রামপাল শর্মা। বিক্ষোভকারীরা কেরল সরকারের বর্বরোচিত ভূমিকার সমালোচনা করে স্লোগান দেন। তাদের অভিযোগ, কেরলে মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে সিপিএম। কেরলের মানুষের জাতীয়তাবোধকে দাবিয়ে রাখার জন্য বেছে বেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিজেপি, অখিল ভারতীয় বিদার্থী পরিষদ এবং হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী সংগঠনের কার্যকর্তাদের খুন করা হচ্ছে। সঙ্ঘ এবং বিজেপির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সিপিএম। মঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয় সিপিএমের ষড়যন্ত্র কোনওভাবেই সফল হবে না। কারণ দেশের মানুষ বামপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং দেশদ্রোহিতার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত। তারা জানেন সারা বিশ্বে বামপন্থার দিন শেষ হয়ে গেছে। এদেশ থেকেও খুব তাড়াতাড়ি ওরা মুছে যাবে।

গুরুগ্রাম :

সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা অসংখ্য মানুষ গুরুগ্রামের মিনি সেক্রেটারিয়েটে এক জনজাগরণ যাত্রায় মিলিত হন। তারপর শুরু হয় ধরনা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন। প্রতিবাদীদের পক্ষ থেকে ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মায়াঙ্ক নির্মল বলেন, 'কেরলে সরকার এবং সিপিএম ক্যাডারদের মধ্যে একটা গোপন সমঝোতা হয়েছে। যার ফলে ওখানে সঙ্ঘ এবং বিজেপির কার্যকর্তারা প্রায় প্রতিদিন খুন হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রের অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

অসম, মেঘালয় উত্তরাখণ্ড মধ্যপ্রদেশ এবং অন্য রাজ্যগুলিতে আয়োজিত সাতশোর বেশি প্রতিবাদ সভায় সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। চণ্ডীগড়ে আয়োজিত সভার অন্যতম বক্তা পাঞ্চজন্য পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক তরুণ বিজয় টুইট-বার্তায় বলেন, 'কেরলের কমিউনিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে চণ্ডীগড় তীব্র প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। পঞ্জাবের মেয়েরাও বাড়িতে বসে না থেকে শামিল হয়েছেন মিছিলে।'

(অর্গানাইজার নিউজ ব্যুরোর সৌজন্যে)

এই সময়

রং-দূষণ

দূষণের মাত্রা সীমা ছাড়ালে রাস্তার কুকুরের গায়ের রং পর্যন্ত নীল হয়ে যেতে পারে।

এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছে নবি মুম্বইয়ের তালোজা শিল্পাঞ্চলে। অভিযোগ, আশে-পাশের রং কারখানার বর্জ্য কাসাডি নদীতে নির্বিচারে ফেলার কারণেই এই বিপত্তি।

ধন্যি মেয়ে

বিয়ের দিন মেয়েদের সাজগোজ করাই রীতি। বাংলাদেশের তসলিম জারা তা মানতে নারাজ। নিজের বিয়েতে তিনি ঠাকুমার

বেনারসি পরেছেন কিন্তু কোনও গয়না পরেননি। মুখে প্রসাধনও করেননি। বিয়ের দিন মেয়েদের চড়া সাজে দেখতে দেখতে 'বোর' হয়ে গেছেন তাই এই সিদ্ধান্ত।

জুতো খুলুন

তেলেঙ্গানার একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ স্বাধীনতা দিবসে জুতো পরেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছিলেন। দৃশ্যটি নজরে

পড়া মাত্র প্রতিবাদে গর্জে উঠল উপস্থিত জনতা, 'জুতো খুলে পতাকায় হাত দিন।' পরে ছাত্ররাও যোগ দেয় প্রতিবাদে।

সমাবেশ -সমাচার

কলকাতায় প্রজ্ঞাপ্রবাহের সভা

গত ২৬ আগস্ট কলকাতার ভারতসভা হলে প্রজ্ঞাপ্রবাহের কলকাতা শাখার 'ভারত বিভাজন ও অখণ্ড ভারত' বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের সর্বভারতীয় সংযোজক ড. সদানন্দ সপ্রে। শ্রীসপ্রে তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ইংরেজ শাসনে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ভারতীয়দের বুদ্ধিভ্রংশ করা হয়। ইংরেজদের মতে ভারতীয়রাও বাইরে থেকে এসেছে। ভারত কোনোদিন এক রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্র গঠন

নাকি তারাই করেছে। শ্রী সপ্রে বলেন, পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রের অবধারণা হলো— জিও পলিটিক্যাল আর ভারতে হলো— জিও কালচারাল। সভায় স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের প্রাদেশিক সংযোজক ড. রাকেশ দাস। সভা পরিচালনা করেন বিভাস মজুমদার।

ফোরাম ফর ইনটেলিজেন্ট প্ল্যানিং অপারেশন আয়োজিত আলোচনা সভা

'স্বাধীনতার ৭০ বছর পর আমরা হিন্দু বাঙালিরা অশনি সংকেত লক্ষ্য করছি। আবার আমাদের উদ্বাস্তু হতে হবে। কেননা রাজ্য সরকারের তোষণ নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশে রূপান্তরিত হতে চলেছে।' গত ১৪ আগস্ট কলকাতায় মহাজাতি সদনে 'ফোরাম ফর ইনটেলিজেন্ট প্ল্যানিং অপারেশন' আয়োজিত এক আলোচনা সভায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এভাবেই সকলকে সতর্ক

করে দেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখতে শাসক দলের তোষণ নীতির বিরুদ্ধে নীরব রয়েছেন। স্বাধীনতার আগে যে তোষণ নীতি শুরু হয়েছিল, বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালেও সেই তোষণ

এই সময়

স্টার-গিন্নি

বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ দু' কোটি টাকা। তাই বাড়িওয়ালা আশ্রম ম্যাট্রিকুলেশন স্কুলের

গেটে তালা লাগিয়ে দিলেন। স্কুলটি চালান দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্তের স্ত্রী লতা রজনীকান্ত। তিনি মানহানির মামলা করার হুমকি দিয়েছেন।

আবু

নাম আবু। জাতিতে কচ্ছপ। দু' সপ্তাহ আগে জাপানের ওকিয়ানা চিড়িয়াখানা থেকে

পালিয়েছিল। ধরে দিতে পারলে ৪,৫০০ মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। নিজেই ধরা দিয়েছে সে।

হাফিজে অরুচি

২৬/১১-য় মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড এবং জামাত- উত-দাওয়ার প্রধান হাফিজ সইদের ভারতবিরোধী কাজকর্মের প্রতিবাদ জানাতে

সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন ইসলামি নেতা এবং ইমামদের একটি সংগঠন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুসলমানরাও একজোট হচ্ছেন এটা ভালো লক্ষণ।

নীতি বজায় ছিল। এরাজ্যে পালাবদলের পরেও তোষণের রাজনীতি চলছে। পশ্চিমবঙ্গে কালিয়াচক, ধুলাগড়, বাদুড়িয়া- বসিরহাটের মতো একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ১৯৪৬-এর সেই দাঙ্গার দিকে পরিস্থিতি গড়াচ্ছে। বুদ্ধিজীবীরা তাই প্রতিবাদী না হলে হিন্দু বাঙালিদের আবার উদ্বাস্তু হতে হবে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে স্বামী পরামাত্মানন্দজী বলেন, গত ৭০ বছরে বহিরঙ্গের উন্নতি হলেও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। এজন্য চাই আত্মবিশ্লেষণ। অধ্যাপিকা লিপি ঘোষ বলেন, যে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু বাঙালিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, সেখানেই তিনি আজ উপেক্ষিত। অধ্যাপক অম্বুজ মহান্তি পাওয়ার প্রেজেন্টেসনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে জনভারসাম্যের কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তা জানিয়ে এর গুরুতর পরিণাম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন কাজী মাসুম আখতার, প্রিয়দর্শী দত্ত প্রমুখ।

জেলায় জেলায় উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জন্মাষ্টমী ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার তিলখোজাতে ১৪ আগস্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহযোগিতায় অখণ্ড ভারত দিবস উদযাপন সমিতির আয়োজনে অখণ্ড ভারত দিবস ও জন্মাষ্টমী উদযাপন করা হয়। ১৫ আগস্ট ময়নার খেজুরতলা বাজারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের আয়োজনে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতীয় তমলুক শাখার উদ্যোগে তমলুকের দেবী বর্গভীমা মন্দিরে

কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বহু কচিকাঁচা ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র ও দূরদর্শনের সাংবাদিক বন্ধুদের অনুষ্ঠানটি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। মহিষাদলের জগন্নাথপুরে আনন্দ নিকেতন সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, পাঠাগার প্রভৃতিতে ৭১তম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহিষাদলের জগন্নাথপুরে আনন্দ নিকেতন সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ময়না পশ্চিম চক্রের অন্তর্গত গোকুলনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে প্রভাতফেরিতে অংশ নেয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে তমলুক স্টিমারঘাট শাখায় স্বাধীনতা দিবসে গরিব ছাত্রছাত্রীদের খাতা ও কলম দেওয়া হয়। তমলুকের ঋষিধামে ওয়ার্ল্ড ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঋষি অরবিন্দের জীবনের বিভিন্ন

এই সময়

সরকারের যোগ্যতা

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, কীভাবে

বিপর্যয় সামাল দিতে হয় তার ন্যূনতম জ্ঞানও এই সরকারের নেই। তাই এরা কথায় কথায় কেন্দ্রকে দোষ দেয়।

সোনিয়া নিখোঁজ

রাহুলের পর এবার সোনিয়া গান্ধী। রায়বেরিলির দেওয়ালে- দেওয়ালে পোস্টার পড়েছে, সোনিয়া গান্ধী নিখোঁজ। অনেকদিন

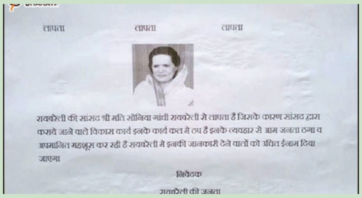

ধরে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধান দিতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।

সংকল্প প্রভা

কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রক সম্প্রতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংকল্প প্রভার আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল গান্ধীজীর রচনা থেকে পাঠ এবং নির্গুণ ভজন। এক অসামান্য

যুগলবন্দিতে মানব গুপ্ত ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নানা মুহূর্ত তুলে ধরেন। এছাড়া, স্বাধীনতার নানা দিক উঠে এসেছে বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীদের প্রয়াসে।

সমাবেশ -সমাচার

দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ব্রহ্মময় নন্দ। হলদিয়ার চৈতন্যপুরের শহিদ পাঠাগারের অনুষ্ঠানকক্ষে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গানের সঙ্গে যোগব্যায়াম প্রদর্শন করে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও গান, আবৃত্তি ও 'গণতন্ত্র ও উন্নয়ন' বিষয়ে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। নন্দীগ্রামের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে ৭১তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।

* * *

প্রতি বছরের মতো এবছরও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস তথা জন্মাষ্টমীর দিন অনুষ্ঠিত হয় মালদার বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতা। এদিন শিশু মন্দিরের অরুণ ও উদয় শ্রেণীর ১১০ জন ভাই-বোন কৃষ্ণ সেজে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ জেলা কার্যবাহ শ্যামল পাল, জেলা আরোগ্যভারতী প্রমুখ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, প্রাথমিক শিক্ষক উত্তম ভট্টাচার্য এবং শিশুমন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, সভানেত্রী। প্রতিযোগিতার পর কৃষ্ণ সাজা ভাইবোনদের নিয়ে ৩১টি টোটো করে ৮ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা হয়। পরে

শিশুমন্দিরের আচার্যরা স্বহস্তে তৈরি করা লুচি, পায়েস, ক্ষীরের নাড়ু, তালের বড়া প্রসাদ হিসেবে শিশু কৃষ্ণদের ভোজন করান। শিশুমন্দিরের সম্পাদক কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিশেষ ৬ জনকে উপহার স্বরূপ গোপাল মূর্তি ও সকলকে গীতা প্রেসের দুটি করে গোপাল ও শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের পুস্তক তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। শেষে শিশুমন্দিরের সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

* * *

গত ১৪ আগস্ট সকালে সিউড়ি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাঙ্গণে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সিউড়ী শহরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতী শাখা। খুদে কৃষ্ণদের দেখতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। খুদেদের মধ্যে কেউ বংশীধারী কেউ সুদর্শনধারী কেউবা গোঠের রাখাল। ননীচোরা থেকে বালগোপাল। এমনকী কালীয়নাগ দমনকারী কৃষ্ণসাজে শিশুদের অভিনয় নজর কাড়ে। মোট ৭২ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। গত ১৬ বছর ধরে সংস্কার ভারতী সিউড়ী শাখার পক্ষ থেকে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা চলছে। সংস্থার সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, ভারতের রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ শিশুদের মনে প্রতিফলিত হোক এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।' জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু শিশুর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা পায়। প্রতিযোগিতায় অভিভাবকরা তাদের শিশুদের শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে আনেন। মুসলমান পরিবারের সন্তানও এদিন সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণ সেজে মঞ্চে উপস্থিত হয়। বিচারক রূপে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী সারথি দাস, নাট্য ব্যক্তিত্ব দেব শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈকত সেনগুপ্ত।

মোদীর স্বপ্নের ভারত গড়া মোটেই অসম্ভব নয়

অতিথি কলম

এম জে আকবর

এ বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইসরোর বিজ্ঞানীরা মাত্র একটি রকেটের সাহায্যে ১০৪টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন। ইন্টারনেটে খুঁজলেই এই যুগান্তকারী ঘটনার ভিডিয়ো দেখা যাবে। মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডী ছাড়িয়ে কীভাবে মহাকাশে প্রবেশ করছে দেখলে তাক লেগে যায়। সব থেকে বড়ো কথা, লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে রকেটটির গতি কোনওভাবে কম হচ্ছে না, বরং বেড়েই চলেছে। এর আগে মাত্র তিনটি রকেট ভারত সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে পাঠাতে পেরেছিল। বাকি ৯৬টি পাঠানোর দায়িত্বে ছিল দুটি আমেরিকান কোম্পানি— প্ল্যানেট ল্যাকস এবং স্পায়ার গ্লোবাল।

মহাকাশে ভারতের এই তৎপরতা তুলনায় কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েকটি বছরে জলমাটির দুনিয়ায় ভারতের অগ্রগমন বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন এক ভারত গড়ার কাজ শুরু করেছেন যেখানে দারিদ্র্য এবং দুর্নীতির মতো ঐতিহাসিক অন্তরায়সমূহ থাকবে না। সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতপাতের মতো দুরপনেয় ক্ষতগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী শুধু স্বপ্ন দেখেননি, স্বপ্নের পাশে তার বাস্তবায়নের একটা তারিখও দিয়েছেন। স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ অর্থাৎ ২০২২-এর মধ্যে ভারত নতুন ভারত হয়ে উঠবে।

যে-কোনও সদর্থক পরিবর্তনের ভিত্তি হলো যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা। মুদ্রা যোজনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে স্থান পেয়েছে নারীর ক্ষমতায়ণ। উল্লেখ্য, মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য সেইসব মানুষ যারা অর্থনৈতিক পিরামিডের একেবারে শেষ ধাপে বাস করে। এই যোজনায় এখনও পর্যন্ত ৩,৫৫,৫৯০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৭৮ শতাংশই মহিলা।

লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে গরিব মানুষের জন্য পরিকল্পিত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

> নতুন ভারত যতই পুরাতনের অঙ্গার থেকে ফিনিক্স পাখির মতো একটু একটু করে হয়ে উঠছে ততই এই নিন্দুকদের কপালের ভাঁজ গভীর হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর সব থেকে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণ এরা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। যদিও গরিবি এবং দুর্নীতির প্রতি নরেন্দ্র মোদীর মনোভাব বিশ্লেষণ করলে তারা উত্তরটা পেয়ে যেতেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একজন মহিলা বাড়ির একমাত্র মালিক হিসেবে এই ঋণ পেতে পারেন। কিন্তু কোনও পুরুষ (বিপত্নীক এবং অবিবাহিতদের বাদ দিয়ে) যদি এই ঋণ পেতে চান তাহলে কোনও একজন মহিলাকে তার সঙ্গে সহ-আবেদনকারিণী হিসেবে আবেদন করতে হবে। পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার সাম্য রক্ষায় এটি একটি অসাধারণ পদক্ষেপ। আগে ভারতের ২৫ কোটি মহিলা বিশ্বাস করতেন রান্নার গ্যাস শুধু মধ্যবিত্ত এবং ধনী পরিবারেই শোভা পায়। নরেন্দ্র মোদীর জমানায় তারাও এখন ধোঁয়াহীন রান্নাঘরে গ্যাসের উনোনে রান্না করছেন। মহিলাদের মর্যাদা এবং স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো স্বচ্ছ ভারত।

মূল লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গরিষ্ঠাংশ বণ্টন করে চল্লিশ কোটি মানুষকে কষ্টকর দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী উচ্চগুণসম্পন্ন অথচ দামে সস্তা প্রযুক্তি নির্মাণে ভারতের স্বাভাবিক দক্ষতাকে ব্যবহার করতে চান। উদ্দেশ্য, একটি কর্মক্ষম, দীর্ঘস্থায়ী এবং দুর্নীতিমুক্ত বণ্টনব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে গরিব মানুষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সরাসরি পান।

এ ব্যাপারে জনধন প্রকল্প ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এবং নিঃসন্দেহে দারুণ সফল পদক্ষেপ। তিন মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলোতে তিনশো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। যারা খুলেছিলেন তাদের অনেকেই জীবনে কোনওদিন ব্যাঙ্কের চৌকাঠ পার হননি। প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়ার আর একটি কারণ স্বচ্ছতা রক্ষা। বিশেষ করে সরকারের

বিভিন্ন চুক্তি এবং আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছতা রক্ষা করা। এদেশে সরকারি চুক্তি এবং দুর্নীতি প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতি থেকে যে উত্তরণ ঘটালেন প্রধানমন্ত্রী তা এককথায় দেশে নীতিগত বিপ্লব এনে দিল। স্বাভাবিক ভাবেই পুরনো ব্যবস্থায় প্রতিপালিত রাজনৈতিক নেতা এবং শিল্পপতিরা প্রমাদ গুণলেন। শুধু তাই নয়, নিজেদের কায়েমি স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষুব্ধ এবং উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

নতুন ভারত যতই পুরাতনের অঙ্গার থেকে ফিনিক্স পাখির মতো একটু একটু করে হয়ে উঠছে ততই এই নিন্দুকদের কপালের ভাঁজ গভীর হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর সব থেকে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণ এরা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। যদিও গরিবি এবং দুর্নীতির প্রতি নরেন্দ্র মোদীর মনোভাব বিশ্লেষণ করলে তারা উত্তরটা পেয়ে যেতেন।

ভারতের জটিলতম উত্তরাধিকারগুলির অন্যতম হলো হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদের রাজনীতি। এটা এমন একটা বিষয় যা মাঝেমাঝেই ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করে এবং দুই পক্ষের মধ্যে নানারকম দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। গোরুকে কেন্দ্র করে এমনই এক দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। মাহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন এ দেশে গোহত্যা বন্ধ হোক। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর এ ব্যাপারে সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। এমনকী, স্বাধীনতার পর কয়েকটি রাজ্যে শাসনক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসও গোমাংস ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবুও দ্বন্দ্বটা থেকে গেছে। ইদানীং গোমাংস ভক্ষণ এবং পরিবহণে যুক্ত থাকার অভিযোগে মুসলমান এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের ওপর গোরক্ষকদের অত্যাচারের কথা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। দুটো ঘটনা মিডিয়া খুব ফলাও করে দেখিয়েছে। প্রথমটি রাজস্থানের পেহলু খান এবং দ্বিতীয়টি হরিয়ানার জুনেইদের ঘটনা।

এখানে বলে রাখা দরকার, কোনও সরকারই অপরাধ পুরোপুরি বন্ধ করতে পারে না। অপরাধ এবং অপরাধীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় সরকার প্রকৃতপক্ষে কী চায়। রাজস্থানে সাতজন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যার অভিযোগ এনেছে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া তাঁর সরকার পক্ষপাতদুষ্ট— এই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মতামত খোলাখুলি প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। যার শিরোনাম ছিল, ‘গণ-প্রতিহিংসা কখনওই সমর্থনযোগ্য নয় (১৭ জুলাই)। যদিও প্রতিতুলনা কোনও প্রশ্নের জবাব হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে না। কিন্তু তিনি যথেষ্ট তথ্য-সহ জারি করেছেন, ২০১২ সালে গণ-প্রতিহিংসা এবং হত্যার ঘটনা রাজস্থানে অনেক বেশি সংখ্যায় ঘটেছিল। সে সময় ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। হরিয়ানায় ঘটনার অব্যবহিত পরে পাঁজজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মূল অভিযুক্ত তখন ফেরার ছিল। পরে মহারাষ্ট্রের সাকরি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবং সেই যে জুনেইদকে ছুরি মেরেছিল তার স্বীকারোক্তিও পুলিশ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

২৯ জুন, সবরবতী আশ্রমের একটি অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদী এই নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর বিস্ময়, নির্বিচার গোহত্যার জন্য গান্ধীজীকে কত না যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। যে কারণে তিনি গোমাতার জন্য প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গোরক্ষার নামে হিংসাকে কখনও সমর্থন করেননি। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও এই ঘটনাকে বর্বরোচিত বলে বর্ণনা করেন।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, গোরক্ষা আন্দোলনের বিরোধিতা করতে নেমে ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথা চালাচালিতে মেতে উঠল। বিশেষ করে কংগ্রেস। ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। যেমন নীতীশকুমার। তিনি কংগ্রেসের এই প্রোপাগাণ্ডায় বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। কারণ তিনি জানেন গোরক্ষা আন্দোলনের বিরোধিতার নামে মুসলমান তোষণ করা ছাড়া শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটির বিশেষ কিছু করণীয় নেই।

২০১৩ সালে পাটনায় একটি মিছিলে নরেন্দ্র মোদীর ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়। সেই সংকট মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, হিন্দু এবং মুসলমানদের কাছে দুটি রাস্তা খোলা আছে। তারা যে-কোনও একটি বেছে নিতে পারে। হয় তারা শুধু নিজেদের মধ্যে লড়াই করুক অথবা লড়াই করুক দেশের প্রকৃত শত্রুর সঙ্গে। যে শত্রুর নাম দারিদ্র্য। ভারতের সৌভ্রাতৃত্বের চেতনা গড়ে তোলা এবং তাদের প্রত্যেকের সমৃদ্ধিই নরেন্দ্র মোদীর একমাত্র লক্ষ্য। জীবনের কাছে তাঁর আর কিছু চাওয়ার নেই।

(লেখক বিদেশমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী)

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

চিঠিপত্র

সীমান্ত সমস্যা ও আমরা

আমরা সীমান্ত বাংলার পেট্রাপোল বর্ডারের আশেপাশে বসবাস করি। সীমান্তের আশেপাশে প্রত্যেক দিনের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা অবহিত। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে মানুষের আনাগোনা লেগে আছে। তুলনামূলক মুসলমানের সংখ্যা বেশি। কারণ মুসলমানদের এদেশে আসার কথা নয় কিন্তু তারাই বেশি আসছে। আর এখনকার ধর্মনিরপক্ষ নেতারা তাদের বসবাসের সুবিধা করে দিচ্ছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা অন্য রাজ্যের হিন্দুদের থেকে একটু বেশি ধর্মনিরপেক্ষ। কারণ এরা মুসলমানদের দ্বারা বিতাড়িত। নিজের জাতির উপর আস্থা কম, মেরুদণ্ডহীন জাত বাঙালি। তার জন্য সীমান্ত লাগোয়া জায়গাতে হিন্দুদের সংখ্যা দিনে দিনে কমছে আর মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে।

যখন দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে দেওয়া হলো, তখন ১৭ শতাংশ মুসলমানদের জন্য ২৩ শতাংশ জায়গা দিয়ে দেওয়া হলো, সেই অনুযায়ী মুসলমানদের এদেশে বসবাস করার কোনো অধিকার নেই (যদি অধিকার দেওয়া হয় সেটা অনুচিত)। আমার মনে হয় যদি কোনো মুসলমান ছেলে হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করে তবে ওই ছেলেটিকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতেই হবে। দরকার হলে এর জন্য আইন পাশ করা উচিত। কারণ এটা হিন্দুস্থান। এখানকার সব লোক জাতিতে হিন্দু। দেশভাগের সময় বাঙালি নেতাদের খুব অভাব ছিল। তার জন্য বাঙালি হিন্দুরা যতজন পাকিস্তান থেকে এদেশে এসেছিল, তারা তাদের সম্পূর্ণ সুবিধা নিতে পারেনি এবং সেখানকার সব হিন্দুরাও পাকিস্তান থেকে আসতে পারেনি। ১৯৪৭ সাল থেকে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার চলছে এবং তারা বিতাড়িত হয়ে খালি হাতে এদেশে আসছে। আস্তে আস্তে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হতে চলেছে। তারা খালি হাতে এদেশে এসে অর্থের অভাবে জায়গা-জমি কিনতে পারেনি। তাই তারা রেললাইনের পাশে, রোডের পাশে এবং সরকারি খাস জমিতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক পার্টি ও এন.জি.ও-এর ছড়াছড়ি, তারা নাকি মানুষের সেবা করে। কই, তারা কি কোনোদিন এই শরণার্থীদের জন্য কোনো সেবামূলক কাজ করেছে? তাদের মূল সমস্যা আর্থিক অনটন। কিন্তু অভাব থাকলেও শিক্ষা তাদের মূল সমস্যা। তাই স্কুলে ভর্তি করতে গেলে জন্ম কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি প্রয়োজন, আর এই সমস্যার জন্য অভাবের মধ্য দিয়ে তাদের নেতা এবং আমলাদের বাড়ি আনাগোনা করতে হয়। কতদিন যে ওই নেতা বা আমলাদের বাড়ি যেতে হবে তার কোনো ঠিক নেই। পাশ থেকে একজন লোক বলছে— ‘‘ওরে দাদা... পয়সা ছাড়া কিছু হবে না।’’ আসলে এরা দালাল। ওদের প্রত্যেককে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি বানানোর জন্য নির্ধারিত একটা পয়সা দিতে হবে এবং ওই দালালদের অনুগত হয়ে চলতে হবে। তারা গণতান্ত্রিকভাবে ভোট দিতে চাইলেও তারা দিতে পারছে না। কারণ তারা গরিব আর গরিব মানুষের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা থাকে না। বর্তমানে ওরা এখন আর্থিক-সামাজিক-শিক্ষাগত দিক থেকে কিছুটা মজবুত হয়েছে। আস্তে আস্তে এদের ভিতরে প্রতিবাদের জায়গা তৈরি হচ্ছে। এরা এখন বলতে চাইছে, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। গর্বের সঙ্গে বলতে শুরু করেছে আমরা হিন্দু। এদের জন্য সুখের খবর হলো, পূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী একটা আইন পাশ করেছিলেন। সেটা কে শরণার্থী আর, কে অনুপ্রবেশকারী সংক্রান্ত। বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী হিন্দুদের জন্য এমন একটি আইন আনছেন--- পৃথিবীর যে-কোনো দেশে বসবাসকারী হিন্দুরা ভারতের নাগরিক হতে পারবে। এর খসড়া বিল গত বৎসর সংসদে পেশ করেছিল। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল এর বিরোধিতা করেছিল। এখন রাজ্যসভায় সংখ্যাবল কম। তাই আগামী বছর এই বিলটা পাশ হয়ে যাবে। আমি শরণার্থীদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে জানাই শত শত প্রণাম।

—**অজিত কুমার বিশ্বাস,**
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

ভারতমাতা পূজা

ভারতমাতাকে আমরা সর্বদাই পূজা করে থাকি। কিন্তু প্রতি বছর ভারতমাতার মূর্তি অথবা অখণ্ড ভারতের কায়াপূজন ১৫ আগস্ট আনুষ্ঠানিক রূপে কেন পালন করি? এটাকে কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান বললে অত্যন্ত অল্প বলা হবে। ভারতমাতার পূজা-অনুষ্ঠান অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ইত্যাদি যে-কোনো উপাসনা-পদ্ধতির উর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রধর্ম পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া এবং তা পালন করবার জন্য যে-কোনো সংগ্রাম, বিপ্লব, স্বার্থ ত্যাগ ও আত্মত্যাগকে বরণ করে নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া।

এই পূজা অনুষ্ঠান তো কেবল নিমিত্ত মাত্র, বিশেষত বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যখন ভারতমাতার একতা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখাই ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নতুন উদ্দীপনায় এই উৎসব আমাদের বিস্মৃত ও স্তিমিত হৃদয়কে পুনর্জীবিত করে থাকে।

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য— ভারতমাতার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ বিশ্বদরবারে প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের দিক থেকে এটা আমাদের চরম প্রাপ্তি। বিবিধ ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস, ভিন্ন ভিন্ন পোশাকের ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য, ভিন্ন জলবায়ু, ভিন্ন মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভিন্ন পূজা পদ্ধতি, ভিন্ন পূজাস্থল, তথাপি আমরা চরম আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করে থাকি। কেননা জানি যে আমরা এক সাংস্কৃতিক সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ।

এই প্রবহমান সংস্কৃতি যা যুগ যুগ ধরে ভারতমাতার ঐতিহ্যময়ী সনাতনী স্বরূপ ও তার পরিচিতি বহন করছে। শুধু তাই নয়, সহস্র ঝড়ঝঞ্ঝা বাধা-বিপত্তি, বিদেশি আততায়ী ও বিধর্মী আক্রমণ ও অত্যাচারকে মোকাবিলা করবার জন্য অদম্য মনোবল, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের মন্ত্রের জোগান দিয়েছে। এই অসামান্য সনাতন ধারার নাম হিন্দুত্ব। হিন্দুত্ব কোনও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নয়, এটা মা ভারতীর আত্মা, তাঁর পরিচিতি পত্র, এটা তাঁর স্বরূপ, তাঁর অস্তিত্ব। ভারত থেকে হিন্দুত্ব আলাদা করা যেমন অসম্ভব, হিন্দুত্ব থেকে ভারত আলাদা করাও অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভারতমাতার দেবীরূপ আমাদের বারংবার মুগ্ধ করেছে, গর্বে আমাদের মন ভরে গিয়েছে। এই সত্যকে যারা পরিহাস করে, ভারতমাতার দেবীরূপকে যারা পুতুল পূজন বলে অবজ্ঞা করে, অশ্রদ্ধা করে, মুখ্য ধারার হিন্দুত্বকে যারা নস্যাৎ করে দেয় তারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী। এদের রাষ্ট্র চিন্তন মূলত শূন্য। রাষ্ট্র সর্বোপরি, রাষ্ট্রবোধই জীবনের মূল মন্ত্র। স্বভূমি, স্বরাজ, স্বাবলম্বন স্বাভিমান ও স্ব-অর্পণই ভারতমাতার মূল পূজা। ভারতমাতার অখণ্ডতা এবং ঐক্যকে কুঠারাঘাত করতে সর্বদা তৎপর ও হিন্দু জাতির একাত্মতাকে ছিন্নভিন্ন করতে এই দেশদ্রোহীরা মুহূর্তের সময় নেয় না। হিন্দু এবং হিন্দুত্ব বিদ্বেষ এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বইছে। এদের ভাবনায় রাষ্ট্র বিরোধী চিন্তন রয়েছে বলেই এরা ভারতবর্ষের সভ্যতার বৈভব, ত্যাগ, তেজস্বিতা, নিষ্ঠা এবং উৎকৃষ্ট জীবন দর্শনের গাথা সম্পর্কে অজ্ঞ। মা ভারতীর পূজায় এরা কীভাবে বন্দে মাতরম্ গাইবে? বর্তমান গণতন্ত্র এদের শুদ্ধিকরণ করতে সক্ষম নয়।

এই বিষাক্ত ভাবধারা ভারতমাতার ঐক্যের রূপের কাছে এমন কর্পূরের ন্যায় উড়ে গেছে যে চিরুনি তল্লাশি করলে তবেই দু-এক স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, প্রদেশ রাজনীতি দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে চিহ্নিতকরণ। মমতা এবং তাঁর সহকর্মীদল, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী, মুলায়ম, অখিলেশ অথবা বিহারের লালু প্রসাদ যাদব এবং তাঁর সমর্থকরা, দিল্লির কেজরিওয়াল ইত্যাদি স্বনামধন্য রাজনেতা নিজ নিজ প্রদেশে ফেডারেল সিস্টেমের মুখোশ পরে যে মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার এবং দ্বিচারিতার দক্ষতা প্রদর্শন করছেন তা সত্যি উপভোগ্য। রাজ্য রাজনীতির মূল্যবোধকে ঢাল করে কেন্দ্র সরকারের যে-কোনও নীতিকে দুর্নীতি বলে অমান্য করে জনগণকে প্রতারিত এবং বঞ্চিত করা হচ্ছে। আরও কিছু এমন নেতার নাম নেওয়া যেতে পারে। যথা— সীতরাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, রাহুল গান্ধী, সুস্মিতা দেব, গৌরব গোগই, ডেরেক ও ব্রায়ান, পম বড্ডাকন প্রমুখ। এরা সর্বদা বিরোধী পক্ষে অবস্থান করে থাকেন। যে-কোনও রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী তত্ত্বের সমর্থক, যে-কোনও বিদেশি শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং প্রয়োজনে লোকসভায় অথবা রাজ্যসভায় তারস্বরে একত্রে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে সবরকম নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে নিজ নিজ বক্তব্য রেখে থাকেন। বর্তমানে এরূপ ঐক্যের দর্শন অবিরাম চলছে।

এমন অবস্থায় এই প্রকার বিষাক্ত কাজকর্মের রাশ টানবার জন্য ভারতমাতার পূজা-অনুষ্ঠান অতি স্বল্প হলেও সামাজিক শুদ্ধিকরণ নিশ্চয়ই করে থাকে। তাই সমগ্র স্বদেশকে ভারতমাতার দেবীরূপে পূজা দুর্গাপূজার মতো উৎসবের ন্যায় পালন করা শুধু সময়েরই দাবি নয়, রাষ্ট্রীয় কর্তব্যও বটে।

—**শ্রীলেখা শ্রীবাস্তব,**
কলকাতা-৩৯।

একক পরিবার ও ভারতীয় সমাজ

একক পরিবারের আদর্শ উদাহরণ— ভগীরথের জন্মকথা। বিজ্ঞান এখনও এ স্তরে উন্নতি ঘটাতে পারেনি। মহাভারতের সমস্ত উজ্জ্বল চরিত্রের জন্ম তো আজকের প্রজনন বিদ্যার উদাহরণ। কিন্তু সর্বত্রই যে পরিবার-বহির্ভূত একক পরিবারের পুত্র বা কন্যা সন্তানের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা বাস্তবিকই একক নয়। মহাভারতের কর্ণের মতো কারো পিতা বা কারো মাতাকে প্রচারের আলোয় না এনেই এদের জন্ম বৃত্তান্তের পরিচয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছে। ফলে এই সব সিঙ্গল ফাদার বা মাদারের পুত্র বা কন্যা সন্তানদের এক অংশ আছে, যাদের স্বীকৃতি নেই। এতে মহত্ত্ব নেই, বংশ ঐতিহ্য ও গরিমার হেরফের ঘটে। মানব সমাজে এ ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। কিন্তু অভিজাত, ধনী, বিকৃত প্রতিবাদী মানুষগণই এযাত্রায় শামিল হচ্ছে। বিপদটি ভবিষ্যতে মানব সমাজের কাছে ক্ষতিকারকও বটে। আমরা কী তবে পশুসমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি?

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্ টাকা

প্রতি কপি ৪.০০ টাকা

জীবন্ত-জাগ্রত গণদেবতা শ্রীগণেশ

সমীর পুরকায়স্থ

আমাদের দেশে যে অনন্য মাতৃভক্ত সমস্ত দেব-দেবীর পূজার প্রারম্ভে পূজিত হন তিনি হলেন শ্রীগণেশ। তাঁর জনপ্রিয় নামগুলি : গণপতি, সর্ব সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধি বিনায়ক, বিঘ্ন বিনাশক ইত্যাদি। বৈদিক যুগ থেকেই গণপতির পূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত। হিন্দুশাস্ত্র মতে গণেশ হচ্ছেন সর্ববিঘ্ন বিনাশক ও সিদ্ধিদাতা। তাই শুধু পূজার্চনা নয়, সর্ববিধ মঙ্গলযজ্ঞের সূচনায় স্মরণ করা হয় গণেশকে। সনাতনপন্থীদের নিকট শ্রীগণেশ অত্যন্ত আপনজন। সকল উদ্যমী নরনারী জীবনের সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধি বা সাফল্য লাভের জন্য নিত্য শ্রীগণেশের নামে আরম্ভ করেন তাঁদের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা। 'ওঁ গণেশায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করে সকলে মনোনিবেশ করেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে।

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিকে গণেশ চতুর্থী বলা হয়। অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রীগণেশ চতুর্থীতে ব্যাপক ভাবে গণেশ পূজা হয়। শোনা যায় সমগ্র দেশে বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে শ্রীগণেশ মন্দিরের সংখ্যাই সবচাইতে বেশি। প্রায় দশ হাজার। মহারাষ্ট্রে আমজনতার কাছে তিনি গণপতি-বাপ্পা। প্রাতঃস্মরণীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক পরাধীন ভারতে সর্বজনীন গণপতি উৎসবের প্রচলন করেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম এই চার দিশায় যে চারটি মন্দির জনপ্রিয় ও বৈভবে পরিপূর্ণ, এগুলি হলো যথাক্রমে বৈষ্ণদেবী, তিরুপতি, শ্রীজগন্নাথ ও সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির। বলা বাহুল্য, মহারাষ্ট্রের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির হলো বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় ও বৈভবশালী শ্রীগণেশ মন্দির। পৃথিবীর কয়েকটি দেশ যেমন— জাপান, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং মেক্সিকোতে স্থানীয় রূপে গণেশজী মন্দিরে পূজিত হন। জানা যায় প্রায় ত্রিশ হাজার বিভিন্ন আকৃতির গণেশ মূর্তি পৃথিবীতে আছে।

যাই হোক, শ্রীগণেশ পূজা ও উৎসব প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসু ভক্তের মনে আসা খুব স্বাভাবিক। প্রশ্নটি হলো গণেশ কে? তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কী? এ প্রসঙ্গে বলতে হয় গণেশের জন্মবৃত্তান্ত বিচিত্র ও বিবিধ। কোনো কোনো পুরাণের মতে গণেশ হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। অপুত্রক দেবীদুর্গার সন্তুষ্টির জন্য তিনি তাকে অর্পণ করেন তাঁর ক্রোড়ে। অন্য পুরাণের মতে গণেশ হচ্ছেন ভগবান শঙ্করের মানসপুত্র। পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ-এর সাকার রূপ আছে। কিন্তু ব্যোম্ বা আকাশের সাকার রূপটি কী? এ বিষয়ে মহাদেব একবার ধ্যান করার সময় তাঁর ধ্যানমূর্তিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন শ্রীগণেশ। তাই বলা যায় গণেশ হচ্ছেন অনন্ত আকাশের একটি সাকার রূপ। বলাবাহুল্য, স্থান কাল ভেদে যেমন প্রথম সমুদ্র দর্শন ও প্রথম দিগন্ত দর্শনের অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তেমনি আপাতদৃষ্টিতে ও দার্শনিক দৃষ্টিতে শ্রীগণপতির স্বরূপ বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য।

আমাদের লৌকিক বিচারে গণেশ হচ্ছেন গণপতি। অর্থাৎ গণ বা সমষ্টি কিংবা জনসাধারণের যিনি নেতা বা অধিপতি, তিনিই হচ্ছেন গণপতি। আবার 'গণ' শব্দের অন্য অর্থ হচ্ছে সেনা। এই অর্থে গণেশ হলেন সেনাপতি বা সেনানায়ক। ঐহিক জগতে অর্থাৎ ইহলোকের কোনো বিরাট কাজের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় ব্যাপক গণ-সমর্থন। লক্ষ-কোটি নরনারী যখন কোনো ভাবাদর্শে আপ্লুত হয়ে সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে উদ্দেশ্য পূরণে এগিয়ে আসেন, তখন সেই উদ্দেশ্য সফল হয়। আবার যেখানে এর অভাব, সেখানে সংকল্প সিদ্ধির পথে দেখা যায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিপত্তি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও সিদ্ধিলাভের জন্য প্রয়োজন হয়— মানসিক বৃত্তিগুলির একাগ্রতা ও তীব্রতা। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে— 'Where there is the will, there is the way' অর্থাৎ সংকল্প দৃঢ় হলেই সিদ্ধি বা সাফল্য নিশ্চিৎ।

আবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 'গণ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়। এই অর্থে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাঁর বশীভূত, তিনি হন সংকল্প বিজয়ী। এই মতে গণেশ পূজা আমাদের শিক্ষা দেয়— জিতেন্দ্রিয় হতে। দেখা যায় যার ব্যক্তিজীবন অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল, সে সমাজকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে না। ফলে দেশ ও জাতির সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কালক্রমে সেই অযোগ্য নেতৃত্বের ক্রমে ক্রমে পরাভব ঘটে। লোকমান্য তিলক যে পন্থায় গণেশ পূজার প্রচলন করেছিলেন পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য, তেমনিভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের পুনরুত্থানের জন্য যুগে যুগে প্রয়োজন সত্যকার সর্বজনীন গণেশ পূজার প্রবর্তন। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, দাসসুলভ

মানসিকতা ও মৌলবাদী চিন্তার যেমন অবসান ঘটবে তেমনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হব। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শুধু ফুল-চন্দনের উপাচারে গণেশের মূর্তি-বিগ্রহকে পূজার্চনা করেই আমরা পরিতুষ্ট হই। ব্যাপক হারে গণসেবা এবং গণচেতনার বিকাশে কোনো উদ্যোগ আগ্রহ কারো দেখা যায় না। ফলত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধি ও সাফল্য হয় সুদূর পরাহত।

আজ বিঘ্ন-বিনাশের প্রলয় কালে আমাদের প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে শ্রীগণেশের চারিত্রিক গুণাবলী অনুধাবন ও অনুসরণ করা। আমরা আগেই জেনেছি যে গণেশ ছিলেন অনন্য মাতৃভক্ত। শোনা যায়— কে বড় এই নিয়ে স্বীয় ভ্রাতা কার্তিকের সঙ্গে তাঁর একদা প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার শর্ত ছিল বিচিত্র। স্থির হয় বিশ্ব পরিক্রমা করে যে সর্বাগ্রে এসে মায়ের চরণ বন্দনা করবে, সেই হবে বিজয়ী। কার্তিকের বাহন ময়ূর। তিনি সেই বাহনে বিদ্যুৎগতিতে বের হলেন বিশ্ব পরিক্রমায়। তিনি ভাবলেন, মন্দগতি মূষিকে চড়ে ভ্রাতা গণেশ পরাজিত হবেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। স্থিরবুদ্ধি গণপতি ভাবলেন— জননী দুর্গাই তো বিশ্বজননী। তাঁকে পরিক্রমা করলেই হবে বিশ্ব-পরিক্রমা। তিনি তাই অনন্য মাতৃভক্তিতে মাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বন্দনা করলেন তাঁর শ্রীচরণ। এদিকে কার্তিকেয় বহুকাল পরে ফিরে এসে দেখলেন ভাই গণেশ সানন্দে মায়ের পাশে বসে আছে। এবার রায় দিলেন দেবী ভগবতী। বললেন— ‘তোমাদের দু’জনের মধ্যে গণেশই হলো বিজয়ী। কারণ, তার আন্তরিক ভাবভক্তিতে আমি মুগ্ধ ও মোহিত হয়েছি। সে আমার মধ্যেই দর্শন করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু। ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ এই চরম তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েছে সে।’

আমরা জানি যে, গণেশ শুধু অনন্য মাতৃভক্তই নয় তিনি ছিলেন মহান বীর এবং সকল বিদ্যায় পারদর্শী। মহাভারত রচনা কালে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্যাসদেবের সহায়ক লিপিকার রূপে।

এবারে বিচিত্র আকৃতির গণেশের স্বরূপ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে হয়। আমরা দেখি গণেশের মূর্তি অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র। দেহটি মানুষের মতো হলেও তাঁর মাথা হাতির মাথার অনুরূপ। তাঁর এই স্বরূপ সম্পর্কে বহু বিচিত্র কাহিনি আছে। এসবের মধ্যে যেটি বহুল প্রচলিত, তা হচ্ছে জননী দুর্গার সনির্বন্ধ অনুরোধে যখন শনিদেব তাঁর নবজাত পুত্র গণেশের মুখের দিকে তাকালেন, তখন তা মুহূর্তের মধ্যেই ভস্মীভূত হলো। এই সংকট মুক্তির জন্য ছুটে এলেন ভগবান বিষ্ণু। তিনি তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের পরম প্রিয় ঐরাবতের শিরশ্ছেদ করে সংযোজিত করলেন গণেশের গ্রীবাদেশে। বিষ্ণু-অংশে জন্ম বলে গণেশের চারহাতে শোভিত শঙ্খ-চক্র- গদা-পদ্ম। এছাড়া গণপতি হচ্ছেন একদন্ত। কারণ হর-পার্বতীর দ্বার রক্ষাকালে পরশুরামের কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয় তাঁর একটি দাঁত এবং তারই রক্তস্রাবের ফলে গণেশের দেহ হয় রক্তাভ।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, গণেশের এই বিচিত্র রূপের মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। গণেশের দেহটি হাতির মতো বিশাল। হাতির আকৃতি পেলেও গণেশের মধ্যে ছিল মানবীয় গুণাবলীর সমাহার ও সমাবেশ। তাই তাঁর নিম্নাঙ্গটি মানুষের অনুরূপ। গণেশ ছিলেন স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়চেতা। নেতৃত্ব প্রদানের জন্য গণেশের চরিত্র সকলকে অনুসরণ করতে হবে। এমনকী নেতার কানও হতে হবে গণেশের কানের মতো বিশাল। অর্থাৎ তিনি তার দূত, গুপ্তচর আদির মুখে শুনবেন সমাজ ও দেশবাসীর সকল অভিযোগ, বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু সুচিন্তিত ভাবে তিনি স্থির করবেন কী করণীয় এবং তা পূর্ণও করবেন অকুতোভয়ে।

এবারে আমরা আলোচনা করব বিশালকায় গণেশের বাহন ওই ক্ষুদ্রাকৃতি মূষিক সম্পর্কে। পুরাণ পাঠে জানা যায় যে গণেশ জন্মকালে উপহার রূপে লাভ করেছিলেন এই মূষিকটি। তিনি নাকি তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত জন্মজাত সুবিজ্ঞ পার্বতী নন্দন গণেশ জানতেন যে, মূষিকের আছে সুতীক্ষ্ণ কর্তনপটু দুটি দাঁত, যার সাহায্যে সে ছেদন করতে পারে কঠিনতম দ্রব্য সামগ্রী। দুর্ভেদ্য পাহাড় বিদীর্ণ করতেও সে সমর্থ তার দন্তপাটির সাহায্যে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইঁদুরের স্বভাব প্রকৃতি বর্ণনা করে জনৈক কবি লিখেছেন—

‘উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার।’

আমাদের আপাত দৃষ্টিতে ইঁদুরের স্বভাব খলের অনুরূপ। কারো মতে ইঁদুরের স্বভাব হচ্ছে চোরের মতো। কারণ, চোরের ন্যায় গোপনেই সে সাধন করে স্বকার্য। কিন্তু দূরদৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হয় যে, যুগে যুগে খলের প্রয়োজন ছিল, আছে এবং থাকবে। যেমন সুদীর্ঘকাল থেকে মানব সভ্যতার উপর যে অবিরাম বর্বরোচিত আক্রমণ চলছে, তার প্রতিরোধকল্পে সমন্বিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় গুপ্তচরবৃত্তি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে। বস্তুত দেখা যায় যে, সাধু সজ্জনকে সতর্ক ও সাবধান করতে খল ব্যক্তিরাই পরোক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়— খল ব্যক্তিদের সুকৌশলে বশীভূত করতে পারলে এরাই প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র ও রণকৌশল সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রভূত সহায়তা করে থাকে। কী ভাল, কী মন্দ উভয়ের শত্রুপক্ষকে ভেদ করার একমাত্র উপায় মূষিক স্বভাবের ব্যক্তিদের ছলে-বলে-কৌশলে বশীভূত করা। জ্ঞানীজনেরা বলেন--- অধ্যাত্মক্ষেত্রে অজ্ঞান জীব অষ্টপাশে আবদ্ধ। তাদের সেই সশক্ত বন্ধন-রজ্জু ছেদনের জন্য প্রয়োজন হয় সুপটু মূষিক-প্রবৃত্তি। সাধকের বিবেক ও বৈরাগ্য হচ্ছে অষ্টপাশ ছেদনের সুতীক্ষ্ণ দু’টি দাঁত। অর্থাৎ সমাজে যারা অশিক্ষিত চোর ও খলের দল, তাদের বাহক হয়ে যদি সুপথে পরিচালিত করা যায়, তবে তারাই হয় যে-কোনো রণজয় ও রাষ্ট্র নির্মাণের পরম হিতকারী সহায়ক। কিন্তু তাদের উপেক্ষা অবজ্ঞা করে যারা শুধু তথাকথিত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তদের উপর নির্ভরশীল, তারা কালে বিফল হতে বাধ্য। তাই গণেশ পূজার মাধ্যমে এই মহান তত্ত্বই আমাদের শিক্ষণীয়, বরণীয় ও করণীয়। প্রত্যেকের জননায়ক হবার যোগ্যতা অর্জন যদি সাধিত হয়, তবেই গণেশ পূজা সার্থক, নচেৎ নয়।

আধুনিক কালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যেমন সমগ্র বিশ্বের জন্য অনিবার্য, তেমনি

বিশ্বকল্যাণে বহুমুখী কর্মোদ্যমও অবিরত আবশ্যক। একদা বিশ্বগুরু ভারতবর্ষ আবারও বিশ্বগুরুর মর্যাদায় আসীন হতে চলেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতের সংগঠনসমূহ বিশ্বে সর্ববৃহৎ আকার ধারণ করেছে। চীনের মহান বিপ্লবী মাও-সে-তুং উক্তি করেছিলেন— "রাজনৈতিক ক্ষমতা সাফল্যের জননী।" এই আপ্তবাক্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিশ্বের সমস্ত অঙ্গনে ভারতবর্ষ আজ স্বমহিমায় অগ্রসরমান। অথচ এদেশেরই কিছু বোকা মানুষ স্বদেশের সমালোচনায় মুখর। কিন্তু তারা জানে না যে পরাধীন ইংরেজ শাসিত ভারতে গণেশ পূজার পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন লোকমান্য তিলক। তাই তিনি পরিবারকেন্দ্রিক পূজাকে দিয়েছিলেন সর্বজনীন উৎসবের রূপ। সে সময় থেকে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুগণ তাঁর নির্দেশে গণেশোৎসবের আয়োজন করেন দশদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। যা আজও চলছে। প্রকৃতপক্ষে তারই ফলে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুগণ আজ সর্বাধিক স্বধর্মনিষ্ঠ ও রাষ্ট্রবাদী সংগঠন প্রিয়। অপ্রিয় সত্য হলেও একটা কথা বলা অত্যন্ত আবশ্যক যে 'সংস্কৃতি' শব্দটা শুধুমাত্র নাচ-গান আর পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেই সীমিত নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে এমন কর্মধারা যা রাষ্ট্রভেদে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক। রাষ্ট্রের সঙ্গে সংস্কৃতির যেমন একটা অভেদ্য সম্পর্ক, তেমনি সম্পর্ক রয়েছে রাজনীতিরও। তাই বলা যায়— সংস্কৃতি কখনই ধর্মনিরপেক্ষ ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ নয়। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় লোকমান্য তিলকের অবদান শুধু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সীমাবদ্ধ নয়, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনবদ্য। বস্তুত তাঁর আদর্শের প্রেরণায় মারাঠি এক দরিদ্র পরিবারের মেধাবী জন্মজাত দেশপ্রেমিক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার প্রবর্তন করেন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'। সঙ্ঘের বহুমুখী কর্মোদ্যম বর্তমান ভারতের দেশপ্রেমী সমাজে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছে। পরিশেষে বলতে হয়, আমাদের গণেশ পূজা সেদিনই সার্থক হবে, যেদিন আমরা সংগঠিত হয়ে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ' এই মন্ত্রে বিভোর হব। তবেই এই গণেশ পূজা গণদেবতারই জীবন্ত জাগ্রত পূজা হবে।

ওঁ সর্ববিঘ্নবিনাশায় সর্বকল্যাণ হেতবে।
পার্বতী প্রিয় পুত্রায় গণেশায় নমো নমঃ।।

কর্মফল কী ও কেন?

রবীন সেনগুপ্ত

হিন্দু পরম্পরায় কর্মফলে বিশ্বাস এক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। হিন্দু শাস্ত্রগুলিতেও বলা আছে যে— কাউকে আঘাত করলে সে কোনো না কোনো সময় প্রত্যাঘাত করবেই। এটাই সমস্ত জীব ও জড় জগতের ঈশ্বরপ্রদত্ত ধর্ম। এরই নাম কর্মফল। তুমি যা যা দান করছ পূর্ববর্তী এবং বর্তমান জন্মে-সেটাই তুমি ফিরে পাবে। যা দাওনি তা কখনও তুমি পেতে পারো না। তুমি যদি অর্থ দান না করে থাক, তাহলে কেউ তোমার দারিদ্র্য ঘোচাতে পারবে না। তুমি যদি কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে থাক সেও পরবর্তী জন্মে তোমাকে হত্যা করবে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাম অবতারে আড়াল থেকে বালি বধের কর্মফল গ্রহণ করেছিলেন। রামচন্দ্রের ইচ্ছাতেই বালির পুত্র পরবর্তী জন্মে জরা ব্যাধ রূপে জন্মে শ্রীকৃষ্ণকে আড়াল থেকে তির মেরে হত্যা করে। শ্রীকৃষ্ণের মতন মহাশক্তিধর ব্যক্তি পায়ে সামান্য তিরের আঘাতে কখনই দেহত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু কর্মফল সত্য প্রমাণ করার জন্যই তিনি ওইভাবে প্রাণত্যাগের লীলা করেছিলেন।

একবার জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র জানাতে চেয়েছিলেন যে কোন পাপে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। তখন ভগবান তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়ে দেন যে ধৃতরাষ্ট্র পূর্বজন্মে বিনা কারণে শত পক্ষী হত্যা করেছিলেন— তাদের চোখে ক্ষত করে দিয়ে। তাই বর্তমান জন্মে তাঁর শতপুত্র নিধন হবে, আর তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন রূপে কষ্ট পাবেন।

কেউ যদি বিনা কারণে হিংস্র আচরণ করেন, পরবর্তী জন্মে তিনি বাঘ সিংহ সাপ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করবেন। যারা খুব নোংরা মনের মানুষ তাদেরকে ঈশ্বর পরবর্তী জন্মে কাক, বিষ্ঠার পোকা ইত্যাদি রূপে জন্ম দেন। একথা হিন্দু শাস্ত্রের নানা শাখায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যাঁরা পোষ্য প্রাণীকে বন্দি করে রেখে কষ্ট প্রদান করেন, তাঁরাও পরবর্তী জন্মে বিনা অপরাধে দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দি থেকে অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হন। গীতাতে বলা আছে, যাঁরা যোগ সাধনা করেও পূর্ণসিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন না, তাঁরা পুনর্বার যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ধনশালী হন এবং যোগসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হন।

এসবের বাস্তব উদাহরণ আমরা সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাই। তখন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি যে কর্মফল মিথ্যা নয়। ■

অঙ্গনা

মেয়েদের আত্মরক্ষার চাবিকাঠি

মহুয়া গিরি

একবার ভাবুন তো শরীর ফিট রাখার জন্য কত কিছুই না করছেন— জিম, ট্রেডমিল, সাঁতার, যোগাসন, মর্নিং ওয়াক, বডি ওয়েট কমানোর জন্য ডায়েটিং কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কী করছেন? পথে ঘাটে কত কিছুই ঘটে। ধরুন রাতে বাড়ি ফিরছেন, নির্জন চেনা-গলির বাঁকে একটি লোক আপনার সামনে যেন ওঁৎ পেতে আছে, হাতে চকচকে ছুরি, আপনি আত্মরক্ষা করতে পারবেন তো? কিংবা ধরুন সিচুয়েশনটা এমনই আপনি জিম সেরে বাড়ি ফিরছেন, রাস্তায় লোক আপনার গলার সোনার হারটি ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। এই সিচুয়েশন অফিস-ফেরতা রাস্তায় কিংবা মর্নিং ওয়াকের সময় পার্কেও হতে পারে। ভেবে দেখেছেন কি আপনি ফিট থাকলেও হয়তো আত্মরক্ষা করতে পারছেন না? টিউশন থেকে ভর সন্ধ্যেবেলা মেয়ে বাড়ি ফিরছে। চারটে ছেলে সামনে-পিছনে বা একটা দ্রুতগামী মোটরসাইকেল। শুধু আপনার মেয়ে কেন? আপনিও এমনই কোনও সিচুয়েশনের মধ্যে পড়তে পারেন। আমরা কীভাবে ডিফেন্ড করব? দেশের সার্বিক অবস্থা যা তাতে সকলকে আত্মরক্ষার মন্ত্রটা শিখে ফেলতে হবে। শরীর ফিট রাখার জন্য জিম, সাঁতার, ডাম্বেল, বারবেল তো রয়েছেই। মেদ বেড়ে যাচ্ছে। তার জন্য ঘাম ঝরাতে হবে। কিন্তু ভেবে দেখুন তো শুধু কি মেদ ঝরালেই চলবে? আত্মরক্ষার কথাটা ভাবতে হবে না?

সেলফ ডিফেন্স আজকের যুগে সবচেয়ে বড় মন্ত্র। আজকের মেয়েদের কাছে আত্মরক্ষাই হলো বেস্ট সলিউশন। তাই দরকার মার্শাল আর্ট। কোনও প্রতিষ্ঠানে, ক্লাবে বা ফিটনেস কনসালটেন্টের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করুন। মার্শাল আর্ট আপনাকে শিখতে হবে ন্যাচারাল অ্যাকটিভিটির জন্য, শরীর মনের রিল্যাকসেশনের জন্য। আবার এই ট্রেনিংই আপনাকে পথে ঘাটে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবে। এই মার্শাল আর্টের সবচেয়ে ভালো দিকটা হলো যে চার থেকে ষাট বছর পর্যন্ত যে কোনও বয়সের মহিলারা এতে অংশ নিতে পারেন। থাই কিং হিসেবে পরিচিত এই মার্শাল আর্ট খুব ন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটি এবং রিল্যাক্স হয় এর অনুশীলনে। আবার বক্সিংয়ের সঙ্গে অনেক মিল আছে মুয়াই থাইয়ের। কনুই আর হাঁটুর ব্যাপক ব্যবহার হয়। সেই সঙ্গে হাতটাও কাজে লাগানো যায়। প্রশিক্ষকদের মতে ফিটনেস সচেতন যে কোনও মহিলার আদর্শ পছন্দ হতে পারে মুয়াই থাই, কারণ ওজন কমিয়ে ফিগার ধরে রাখতে সাহায্য করার পাশাপাশি মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে এই ব্যায়াম। তাছাড়া আত্মরক্ষার কায়দাও শেখায়, সেটা আবার বাড়তি পাওনা। হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাটে যাওয়ার আগে অন্ততপক্ষে মাস ছয়েক প্রাথমিক লেভেলের মার্শাল আর্ট করানো হয়, প্রাথমিক ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ শেখানোও হয়। তারপর হিট, ব্লক আর কিক কায়দা শেখানো হয়। মুয়াই থাইয়ে কিক, পাঞ্চ আর ব্লক করার সময় হিপ রোটেট করাও শেখানো হয়। পেট এবং তার আশপাশের পেশিগুলোও ব্যবহার করা হয় সেই সঙ্গে হিপ আর পা যোগ হলে বাড়তি জোর আসে। হঠাৎ করে কাছ থেকে আক্রমণ হলে কনুই দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করবার কায়দা শেখানো হয়।

প্রত্যেকটা মেয়ের উচিত আত্মরক্ষার কায়দাগুলো শিখে নেওয়া। ধরুন অফিস থেকে বেরনোর পর শুনশান পার্কিং লটে বড়সড় চেহারার কোনও পুরুষ আক্রমণ করল আপনাকে, তার হাতের ছুরিটা চকচক করছে আলোয়। এই ধরনের আক্রমণে রিঅ্যাক্ট করার জন্য কয়েক সেকেন্ডের চেয়ে বেশি সময় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রমণকারীও অনেক বেশি শক্তিশালী এবং বড়সড় চেহারার হয়। এই ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝার ফর্মুলাটাই শিখিয়ে দেবে এই যুদ্ধবিদ্যা। ক্রাভ মাগায় কোনও হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, নেই কোনও টেকনিক। আগেই বলা হয়েছে, অতর্কিত আক্রমণ ঠেকানোর কায়দা শেখানো হয়। এই সেলফ ডিফেন্স টেকনিক এবং কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আততায়ীকে ঠেকানো অসম্ভব। বরং কোন পরিস্থিতিতে আক্রমণ হতে পারে, সেটা আঁচ করতে পারা এবং সেইমতো সতর্ক হওয়া অনেক বেশি জরুরি। মহিলাদের পক্ষে কেন এই সেলফ ডিফেন্স টেকনিক বেশি কাজের? কারণ বড়সড় শরীরের আক্রমণকারীরা মহিলাদেরই বেশি সমস্যায় ফেলতে পারেন। শরীরের উপর বড় চেহারার কোনও মানুষের চাপ পড়লে সাধারণত মহিলাদের পক্ষে প্রতি আক্রমণে যাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ক্রাভ মাগা জানলে সেটা কোনও সমস্যা নয়। হঠাৎ আক্রমণে বিপর্যস্ত? মাথা কাজ করছে না? বুঝতে পারছেন না কীভাবে রিঅ্যাক্ট করা উচিত? ক্রাভ মাগা জানলে নো টেনশন। মনের সাহায্য না পেলেও স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে শরীর রিঅ্যাক্ট করবেই। আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। বাড়ে শরীর মনের কো-অর্ডিনেশন। সেইসঙ্গে মাসল টোনড আপ হয়। ট্রেনিং সেশনে কার্ডিও এক্সারসাইজ হিসেবে ইজরায়েলি কিক বক্সিং প্র্যাকটিস হয়। অনায়াসে করতে পারেন এই ক্লাস।

(সৌজন্য : দৈনিক সংবাদ)

কোন মুড়ি খাবেন

ডাঃ রিংকী ব্যানার্জী

শহর ও গ্রামে মুড়ি একটি সহজলভ্য খাবার। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব খাদ্যে ভেজাল বেড়েছে। মানুষ হয়ে মানুষকে নানাভাবে বিষ খাওয়াতে সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না। মুড়িতেও বিষ মেশানো হচ্ছে। মুড়িকে সাদা ধবধবে বানাতে এবং ফোলা করতে মুড়ি ভাজার সময় ইউরিয়া মেশানো হচ্ছে। এই ধবধবে সাদা ফোলা মুড়ি আমাদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু নিয়মিত এই ইউরিয়াযুক্ত মূর্তি খেলে কী বিপদ হতে পারে তা ভেবে দেখি না। মুড়ির পুষ্টিগুণ নেই বললেই চলে। এতে ক্যালোরি নেই বলা চলে। মুড়িকে মুখরোচক করতে মুড়িতে সর্ষের তেল, শসা, টমেটো, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি মেশানো হয়। সকাল-বিকেল টিফিন হয় মুড়ি দিয়ে গ্রামে ও শহরে। যারা হোস্টেলে বা মেসে থাকেন তারা টিফিনে মুড়ি রাখেন। যাদের ঘন ঘন ক্ষুধা পায় তারা সঙ্গে মুড়ি রাখেন। যারা মোটাসোটা তারা ওজন কমাতে মুড়ি খান। কারণ মুড়ি ক্যালোরিহীন।

মুড়ির উপকার-অপকার উভয়ই আছে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপকারই বেশি। যদের পেটে গোলমাল আছে তারা মুড়ি খান। ডায়েরিয়া হলে মুড়ি ভেজানো জল পান করলে উপকার হয়। কেননা মুড়ি ভাজার সময় চালের সঙ্গে লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া হয় ফোলানোর জন্য। বারবার পায়খানা হলে শরীর থেকে যে ইলেকট্রোলাইট বেরিয়ে যায়, মুড়ি বা মুড়ি ভেজানো জল তা খানিকটা পূরণ করতে পারে। তবে ডায়রিয়া হলে মুড়ি ভেজানো জলের চেয়ে নুন, চিনি, নুনগুড় মেশানো স্যালাইন শ্রেয়। অনেকে মনে করেন যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে তাদের জন্য মুড়ি ভালো খাবার এটা মোটেই সঠিক নয়। মুড়িতে লবণ বেশি হলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। বর্তমানে মুড়ি খাওয়া বিপজ্জনক হয়েছে মুড়ি বানানোর সময় ইউরিয়া মেশানোয়। এমনিতে মানুষের শরীরে বেশ কিছুটা ইউরিয়া থাকে, তারপর মুড়ির সঙ্গে যদি বারবার শরীরে ইউরিয়া ঢুকতে থাকে, তাহলে দেহের ইউরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তখন শরীরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

অনেকে হয়তো জানেন, আমাদের দুটো কিডনি ইউরিয়া বের করে দিচ্ছে অনবরত। কিন্তু এর মাত্রা যদি সীমা অতিক্রম করে, তবে কিডনি তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। তখন মহাবিপদ। তখন ডায়ালিসিস করানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। পরীক্ষার দেখা গেছে, এক-শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ দিয়ে মুড়ি ভাজলে মুড়িতে এর প্রায় সত্তর থেকে পঁচাত্তর শতাংশ ইউরিয়া থেকে যায়। ১০০ গ্রাম এ রকম মুড়ি খেলে শরীরে ঢোকে ৭০০ মিগ্রা ইউরিয়া। দিনে যদি তিন-চার শো গ্রাম মুড়ি খাওয়া হয়, তাহলে দৈনিক ২১০০ থেকে ২৪০০ মিগ্রা ইউরিয়া ঢুকবে। ফলে কিডনির ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হবে। তারপর ওই ইউরিয়া লিভারের ওপরও চাপ সৃষ্টি করবে। তাহলে বুঝে দেখুন রোজ যদি ওই ইউরিয়াযুক্ত মুড়ি খান, তাহলে কী বিপদ হতে পারে। নিশ্চিত কিডনি ও লিভার সমস্যা।

তাই মুড়ি নিজেরা ভেজে খান। যদি কিনে খেতেই হয়, তাহলে সাদা ধবধবে রঙে না ভুলে বা ফোলা মুড়ি না দেখে, লালচে গ্রামের গরিব মানুষের ভাজা মুড়ি খাওয়া ভালো। ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে বা যানবাহনে ঝালমুড়ি কিনে না খাওয়াই ভালো। যারা উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি সমস্যা বা হৃদরোগে ভুগছেন তাদের বাজার থেকে মুড়ি কিনে না খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যাদের লিভার সমস্যা আছেন, তাদের বেলায়ও একই কথা বলা চলে। গর্ভবতী মহিলা যাদের পা ফোলা, শিশু ও বৃদ্ধদের ইউরিয়াযুক্ত মুড়ি না খেয়ে বাড়িতে ভাজা মুড়ি খাওয়া ভালো। মুড়ির সঙ্গে আচার, লবণ বা মুখরোচক কিছু মেলাবেন না। নুন ছড়িয়ে দেবেন না। কারণ, নুন হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড। ওটা কিডনি, হার্ট, রক্তচাপ ও লিভারের জন্য খারাপ।

খালি পেটে ইউরিয়াযুক্ত মুড়ি খাওয়ার চেয়ে ভেজানো চিঁড়া ও দই অনেক ভালো নয় কি? মুড়ি যদি খেতেই হয়, তাহলে বাজারে মুড়ি না খেয়ে নিজেরা ভেজে খান। ওটা হবে স্বাস্থ্যসম্মত।

(লেখিকা মহিলা শাখার সম্পাদিকা : ডব্লু. এফ. এইচ)

কাজী নজরুলের ‘নতুনের গান’-এর পটকথা

শুভঙ্কর দাস

উনিশ শতকের বিশের দশক ছিল বাংলার নবজাগরণের নবোচ্ছ্বাসিত সাংস্কৃতিক ফিউশন প্রক্রিয়ার গোধূলিকাল। এই দশকের শেষলগ্নে পূর্ব-বাংলার মুসলমান সমাজকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ভাবনায় জাগরুক করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে ঢাকা যুক্তিবাদী আন্দোলন। ঢাকা কেন্দ্রিক এই গোষ্ঠীর উদ্যোগে ১৯২৬ সালে গঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে এক সংগঠন। সে সময়ে মৌলবাদীরা হাদিসকে হাতিয়ার করে শোষণ নিপীড়নের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজের মূল্যবোধকে অবক্ষয়ের হাতে সঁপে দিয়েছিল। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ছিল এই সংগঠনের আসল লক্ষ্য। ১৯২৮ সালে এই সংগঠনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নজরুল ইসলাম সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। এই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য নজরুল ঢাকায় আসেন। সেখানে সৈয়দ আবুল হোসেনের অনুরোধে তাঁর বাসভবনে রাত্রিবাস করেন। এখানে রাত্রিযাপনকালীন নজরুল ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...’ গানটি রচনা ও সুরারোপিত করেন। পরের দিন মুসলিম সাহিত্য সমাজের সভায় কবি সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধনী গান হিসেবে এই গানটি পরিবেশন করেন। ওই বছরের অক্টোবর মাসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ‘শিখা’র দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশ পায়। কাজী মোতাহারের সম্পাদনায় শিখা পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যার সারগর্ভ প্রবন্ধগুলোর মাঝে ‘নতুনের গান’ শিরোনামে গানটি স্থান পায়। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৯ সালে নজরুলের ২৪টি কবিতা সংবলিত সন্ধ্যাকাব্য গ্রন্থটি প্রকাশ ঘটলে এই গানটি কবিতা রূপে ওই কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে সওগাত, প্রগতি, মোয়াজ্জিন পত্রিকাগুলোতে এই গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। এতো গেল এই গানের পশ্চাৎপটের কথা। এবার গানটির সমাদৃতের প্রেক্ষাপট নিয়ে কতিপয় ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক।

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলী ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের উপস্থিতিতে কলকাতার আলবার্ট হলে নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এই বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে ‘চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে...’ গানটি গেয়ে কথকতারীতির খ্যাতনামা গায়ক উমানাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। এই গান শুনে নেতাজী অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর শুভেচ্ছা ভাষণে বলেছিলেন, ‘আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব, তখন সেখানে নজরুলের এই যুদ্ধের গানটি গাওয়া হবে।’ পরে এই গানের ভাবানুসঙ্গে তিনি তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজে প্যারেডের গান হিসেবে ‘কদম কদম বঢ়ায়ে যা’ গানটিকে ব্যবহার করেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন এই গানটির মহাশ্মশান’-এর পরিবর্তে ‘গোরস্থান’ শব্দটি প্রতিস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার সরকারি পাঠ্য বইতে এই গানটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই গানটি সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি রয়েছে। তা হচ্ছে ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে...’, গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু দুটি কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। প্রথম কারণ হচ্ছে ‘সজীব করিব মহাশ্মশান’। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই গানে কিছু শব্দ রয়েছে যেমন ‘নিম্নে উতলা’, ‘ধরণী তল’, ‘অরুণ প্রাতে’, ‘বাধার বিন্ধ্যাচল’, ‘তখত-তাউস’ যা উচ্চশিক্ষিত লোক

ছাড়া অতি অল্পশিক্ষিত মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা ও বোঝা অনেকটা কষ্টসাধ্য। ফলে অন্তর দিয়ে স্বছন্দে এই গান গাওয়ার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন রয়ে যায়। তাই জাতীয় সঙ্গীত গায়নের সারল্য বজায় রাখার নিরিখে ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে...’ গানটি মনোনীত হয়নি। সবদিক বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মনোনীত হয়। একগুঁয়ে বাষ্পাচ্ছন্ন মননের মুসলমান বিদ্বজ্জনেরা আজও এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়নি। তাঁদের ব্যাখ্যায় ‘ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে’ এই লাইনটিতে কবি ‘মা’ শব্দটি হিন্দুদের দেবী ভাবার্থে এই গানে ব্যবহার করেছেন যা তাঁদের আপত্তির কারণ। কিন্তু কবি যখন গানটি লেখেন তখন বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়নি। কবির কল্পনায় এখানে অখণ্ড বাংলার রূপমাধুরীকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই গানের যথার্থ্য নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠে না। যাইহোক বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠন হওয়ার পর প্রথম মন্ত্রীসভাতে ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে...’ গানটি কুচকাওয়াজের গান হিসেবে গৃহীত হয়। পাশাপাশি যে কোনো সামরিক অনুষ্ঠানে এই গানটির ২১ লাইন যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করার রীতি চালু হয়। এই থেকে বোঝা যায় তদানীন্তন সময়ে সরকার ও জনমানসে গানটি কীভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

এবার এই গানের সাঙ্গীতিক প্রেক্ষাপটের সম্পর্কে কিছু কথা। ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে...’ গানটিকে একটি বিদেশি তাল ছন্দের ভিত্তিতে কবি সুরারোপিত করেছেন। এই তালটির নাম di-Marcia Waltz, 6/8 time। সাধারণত Waltz তালের সঙ্গে আমরা পরিচিত যার ছন্দ 3/4 time। এখানে সাঙ্গীতিক লয়ের গতি বোঝাতে di-Marcia কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা একমাত্র মার্চ সং-য়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেহেতু di-Marcia দ্রুত লয় তাই তার ছন্দ বোঝাতে 6/8 time লেখা হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে এটা জলদ দাদরা তালের সমতুল্য। ১৯৩৩ সালে ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে...’ গানটি প্রথম সমবেত কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশ করে মেগাফোন গ্রামোফোন কোম্পানি। তারপর এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জনপ্রিয় গায়ক ধীরেন্দ্রনাথ দাসের (১৯০২-১৯৬১) কণ্ঠে গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশ করে এইচ.এম.ভি. গ্রামোফোন কোম্পানি। পরবর্তীতে ঢাকা আকাশবাণীর বেতার শিল্পী শিরীন চক্রবর্তীর (১৩১৯-১৩৭২ বঙ্গাব্দ) কণ্ঠে গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড এইচ.এম.ভি. গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে এবং গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের (১৯১৬-১৯৮৩) কণ্ঠে গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশ পায়। তৎকালীন সমাজে এই গানের বাণী ও সুরধ্বনি তরুণ বিপ্লবীদের কাছে যেমন প্রিয় ছিল, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। এমনকী আজও দুই বাংলার জনমানসে এই গানটি সমানভাবে জনপ্রিয়।

(লেখক মালদা জেলা ফককালচার স্টাডির সেক্রেটারি)

অতীতের ডায়েরি থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে ১৯২৯ সালের ১০ অক্টোবর কাজি নজরুল ইসলামকে সম্মান জানিয়েছিল কলকাতা। সম্মান জ্ঞাপনের আসর বসেছিল ব্রিটিশ কলকাতার অ্যালবার্ট হলে। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় নজরুলের কাব্যপ্রতিভার প্রশংসা করে বলেছিলেন, ‘আমার বিশ্বাস নজরুলের কবিতা পড়ে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ছেলেরা একদিন সুপারম্যান হয়ে উঠবে।’ নেতাজী বলেছিলেন, ‘আমরা যখন যুদ্ধে যাই তখন নজরুলের যুদ্ধের গান গাই। জেলে থাকার সময়েও এর অন্যথা হয় না।’ ১৯৩৯ সালে নজরুল আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত হন। বহু স্মরণীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান তিনি করেছেন। তার মধ্যে হারামণি, মেল-মিলন এবং নবরাগমালিকা আজও কিছু প্রবীণ মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২— এই তিন বছর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং নজরুলের যৌথ উদ্যোগে বেশ কিছু মনে রাখার মতো সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছিল।

শোকসংবাদ

গত ২৮ জুলাই হাওড়া জেলার ডোমজুড় খণ্ডের হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা তাপস মুখার্জীর পিতা প্রাক্তন ভারতীয় সেনাকর্মী অমিয় মুখার্জীর জীবনাবসান হয়।

* * *

গত ২০ জুলাই হাওড়া জেলার সাঁকরাইল খণ্ডের সঙ্ঘের শারীরিক প্রমুখ গগনচাঁদ মণ্ডলের পিতা শ্যামাপদ মণ্ডল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

গত ১৮ জুলাই মালদা জেলার তুলসীহাটা মণ্ডলের সঙ্ঘের কার্যবাহ চিন্ময় সাহার পিতা মানিক চন্দ্র সাহা দীর্ঘরোগের পর ৬৭ বৎসর বয়সে নিজ বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ১ কন্যা, জামাতা এবং নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

সঙ্ঘের নদীয়া বিভাগ কার্যকারিণীর সদস্য পলাশীশাখার স্বয়ংসেবক তপন রঞ্জন দে-র মেজদা নিরঞ্জন দে গত ৫ আগস্ট পরলোকগমন করেন।

* * *

সঙ্ঘের নদীয়া জেলার পলাশী শাখার স্বয়ংসেবক গোপী কৃষ্ণান চৌধুরীর বাবা যুগলকিশোর চৌধুরী গত ৩১ জুলাই পরলোকগমন করেন।

খেলনা তৈরির দিকপাল কারিগর পনেরো বছরের বিবেক

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কিংবদন্তী শিল্পী পাবলো পিকাসো একবার বলেছিলেন, 'প্রত্যেক শিশুই এক-একজন শিল্পী। কিন্তু বড়ো হবার পর তাদের শিল্পীসত্তা বাঁচিয়ে রাখা একটা দুরূহ সমস্যা।' সুপ্ত প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হবার পর খুব কম শিশুই বিকাশের পথ খুঁজে পায়। আমাদের দেশে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার করে তুলতে একটিও পাথর উল্টে দেখতে বাকি রাখেন না। নির্বিচার ইঁদুরদৌড়ে নেমে স্বাভাবিকভাবেই শিশুরা হারিয়ে ফেলে তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা পনেরো বছরের এক কিশোর এমন একটি পথ বেছে নিয়েছে যা গড্ডলিকা প্রবাহের আমূল বিরোধী। সন্তানের যে বয়েসে বাবা-মায়েরা আইআইটি কিংবা এমবিবিএস-এর কথা ভাবেন, ঠিক তখনই নাগেশ এবং রেশমি ছেলেকে তার নিজস্ব কক্ষপথ খুঁজে নিতে সাহায্য করেছিলেন। ছেলে অর্থাৎ বিবেকও সঠিক দিশায় পা ফেলতে ভুল করেনি।

বিবেক কাঠের খেলনা বানায়। সেইসব খেলনার বেশিরভাগই শিক্ষার প্রয়োজনে কাজে লাগে। আপাতত সে মন্তেশ্বরী পাঠক্রমের উপযোগী নানারকম স্টাডি মেটেরিয়াল তৈরিতে ব্যস্ত। এই খেলনা তৈরি এখন আর তার শুধু শখ নয়। কর্ণাটকের ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের পরিমণ্ডলে ১৫ বছরের বিবেকের নাম ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলো ছড়াতে শুরু করেছে।

বিবেক যখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র, সেই সময় নাগেশ এবং রেশমি প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় বিবেকের মেধা ঠিকমতো পরিস্ফুট হচ্ছে না। রেশমি বলেন, 'তার মানে এই নয় যে বিবেক পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিল। বরং যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই সে পড়াশোনা করত। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সে

আর ওই বিপুল চাপ সামলাতে পারত না।' এই সময় প্রায়শই বিবেক পড়াশোনা নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়ত। প্রচণ্ড চাপে ভেঙে পড়ত তার আত্মবিশ্বাস। দিনের পর দিন এসব দেখে নাগেশ আর রেশমি মনে করলেন বিবেকের জন্য বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। এমন একটি শিক্ষাক্রম যা বিবেকের মেধা এবং মননশীলতাকে ধ্বংস করে দেবে না। নাগেশ বলেন, 'প্রায় প্রতিদিন বিবেকের নামে অভিযোগ শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা বুঝতে পারছিলাম প্রচলিত স্কুলশিক্ষায় সব ছাত্রই উপকৃত হবে এমন কোনও কথা নেই। সব থেকে বড়ো কথা আমরা চাইনি আমাদের ছেলের প্রতিভা অকালেই নষ্ট হয়ে যাক।'

মাসাধিককাল গবেষণার পর রেশমি খোঁজ পেলেন অরিঙ্কো অ্যাকাডেমির। এটা এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদের পাঠক্রম ছাত্রছাত্রীদের জন্মগত প্রতিভার ওপর ভিত্তি করে বেছে নেওয়া হয়। রেশমি বলেন, 'বিবেককে অরিঙ্কোয় ভর্তি করার কয়েক মাসের মধ্যে একেবারে হাতেনাতে ফল পেলাম। নানান কোর্সের মধ্যে বিবেক বেছে নিল কারপেন্ট্রি। তারপর কাঠের জিনিস তৈরি করার আনন্দে একেবারে বুঁদ হয়ে গেল।'

কাঠের জিনিস তৈরিতে বিবেকের উৎসাহ প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন অরিঙ্কোর অধ্যক্ষ অনুপ কেনি। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রতিভাবান এই ছাত্রটিকে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলবেন। রেশমি বলেন, 'এমনও দিন গেছে যখন আমি স্কুলের গেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতাম, ভেতরে বিবেক আর অনুপস্যার কাজ করে যেত। দু'জনের কারোরই সময়ের হুঁশ থাকত না।' রেশমি বলে চলেন, 'অনুপস্যারই প্রথম বিবেককে অ্যাকাডেমির জন্য বেশ কিছু কিউবিকল বানানোর অ্যাসাইনমেন্ট দেন। সেটাই প্রথম বিবেকের ব্যবসায়িক কাজ। এক মাসের মধ্যে বিবেক কাজ শেষ করে। ওর বানানো কিউবিকল এখনও অ্যাকাডেমিতে নতুন আসা ছাত্রদের বিবেকের উদাহরণ দেবার জন্য অনুপস্যার রেখে দিয়েছেন।'

মাত্র পনেরো বছর বয়েসে অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠা মুখের কথা নয়। কিন্তু বিবেকের বিশ্বাস নিজের সাফল্যই শেষ কথা হতে পারে না। সে আরও অনেক শিশুকে সাহায্য করতে চায়। যাতে তারা স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নকে সফল করে তুলতে পারে। সেই জন্যই সে ফেসবুক পেজ খুলেছে। নাম কিংউড কারপেন্ট্রি। উৎসাহীরা যোগাযোগ করতে পারো।

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ৩৭

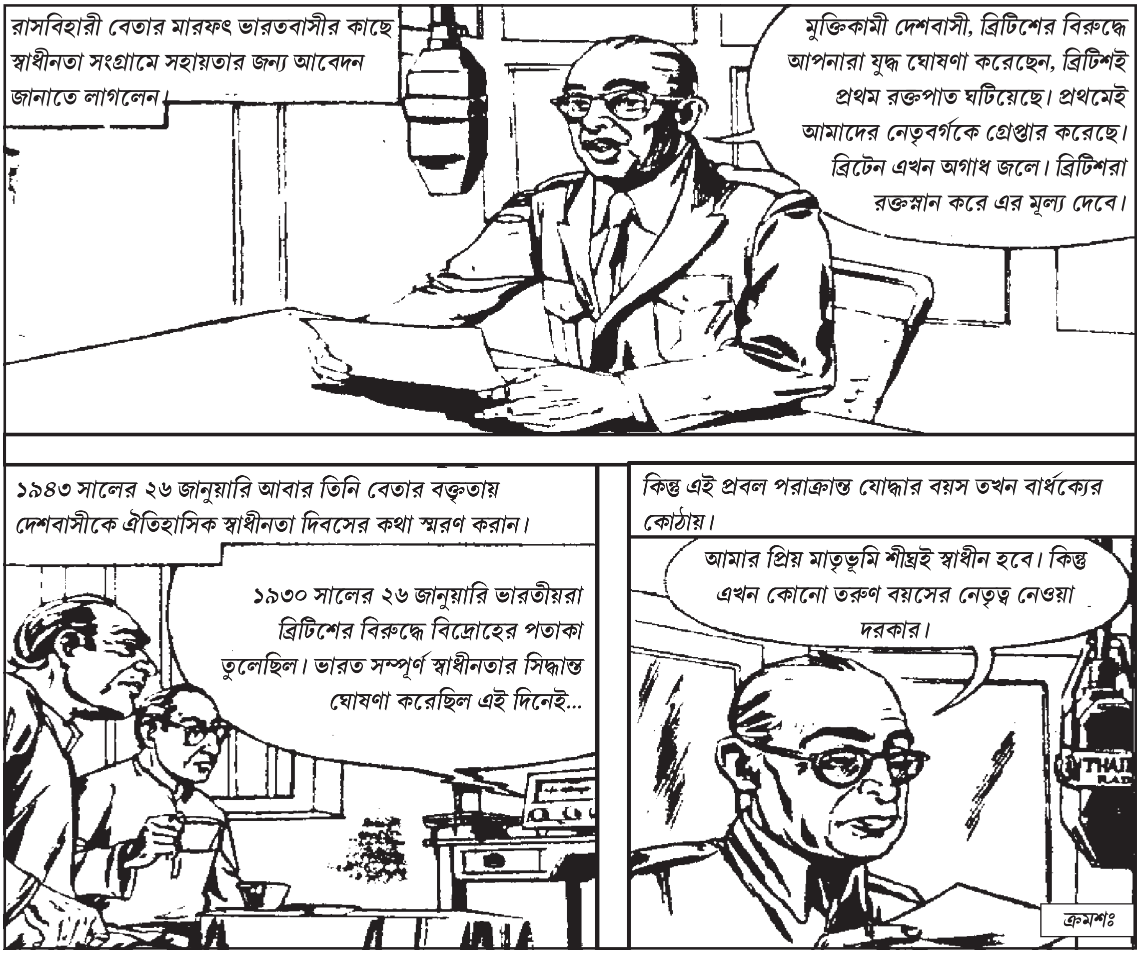

শব্দরূপ-৮৩৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	■	■	■	১		২
■	৩		৪	■		■	
৫	■	■	৬			■	
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮			
	■	৯			■	■	
	■		■	১০			■
১১			■	■	■	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বাখরগঞ্জ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সরু চাউল বিশেষ, ৩. ডুগডুগি, ৬. ভিক্ষাকরণ, যাচন, ৭. পুরাণোক্ত পাতাল বিশেষ, ৮. কপোত, পায়রা, ৯. দশমহাবিদ্যার এক, ১০. ভিক্ষু, দরবেশ, সন্ন্যাসী, ১১. তৃণধান্য।

উপর-নীচ : ১. বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার, ২. মীনধ্বজ, কন্দর্প; প্রথমার্ধে গঙ্গাদেবীর বাহন, ৪. মুখ মোছবার বস্ত্রখণ্ড, ৫. যা দিয়ে মৃতকে জীবিত করতে পারা যায়, ৮. দিল্লির বিখ্যাত বিমানবন্দর, ৯. অসভ্য, মূর্খ নীচ।

সমাধান : শব্দরূপ-৮৩৭

হো	মা	র	■	তা	ই	গা	■
গ	■	ভ	■	তা	■	ব	■
লা	ল	স	■	থ	■	গু	■
■	ঘু	■	■	ই	রা	বা	ন
আ	গু	য়া	ন	■	■	গু	■
■	রু	■	চি	■	ছো	ব	ল
■	জ্ঞা	■	কে	■	হা	■	হ
■	ন	ন্দি	তা	■	রা	না	র

সঠিক উত্তরদাতা

রামু সূত্রধর, সরকারপাড়া, পুরুলিয়া
সঞ্জয় পাল, সাহাপুর, মালদা
শিবেন্দ্রনাথ রায়, ঝালদা, পুরুলিয়া

৮৪০ সংখ্যার সমাধান পরের সংখ্যায়।

নবাঙ্কুর

মৎস্যরানির শিক্ষা

গঙ্গায় ছোট মাছ ধরা নিষেধ। মৎস্যরানি খুব খুশি হয়েছিল এই কথা শুনে। যাক তাহলে ছানাদের আর ভয় নেই। প্রতি বছর কত ছোট মাছ অকালে প্রাণ হারায়। এখন তা আর হবে না।

কিছুদিন পর মৎস্যরানি খেয়াল করলো মাছ ধরা বন্ধ হয়নি। জেলেরা আগের মতোই মাছ ধরছে। তারা নদীর জলে খাবার ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেই খাবারের লোভে ছোটমাছগুলি জালে ধরা পড়ছে। মৎস্যরানি তখন ছোট মাছেদের ডেকে বললো— শোন বৎসগণ, আমাদের যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে নিজেদের বুদ্ধিতে বাঁচতে হবে। মানুষের তৈরি আইন আমাদের কোনো উপকারে আসবে না। গঙ্গায় ছোটমাছ ধরা যাবে না, মানুষ এই আইন তৈরি করেছে। কিন্তু তারাই আবার চুপি চুপি ছোটমাছ ধরছে।

ছোটমাছেরা বললো--- রানিমা আমাদের তাহলে কী করা উচিত?

রানিমা বলল— আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করবো, জেলেদের ছড়ানো খাবার আমরা খাবো না। জেলেরা জলে খাবার ছড়ালে আমরা খাবারের দিকে না গিয়ে জলের গভীরে চলে যাবো। যাতে কেউ জালে ধরা না পড়ি।

ছোট মাছেরা সবাই সমস্বরে বলল— আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, জেলেদের ছড়ানো খাবার আমরা খাবো না।

এর ফল খুব ভালো হলো। অনেক ছোটমাছ সেবছর বেঁচে গেল। কেবল কিছু লোভী মাছ ধরা পড়লো জালে। কিন্তু একবছর এরকম প্রতিজ্ঞা পালন করলে হবে না। বছরের পর বছর তা পালন করতে হবে। নতুন প্রজন্মকেও তা শেখাতে হবে। তবেই ছোটমাছ জেলেদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। মাছেদের বংশ রক্ষা হবে।

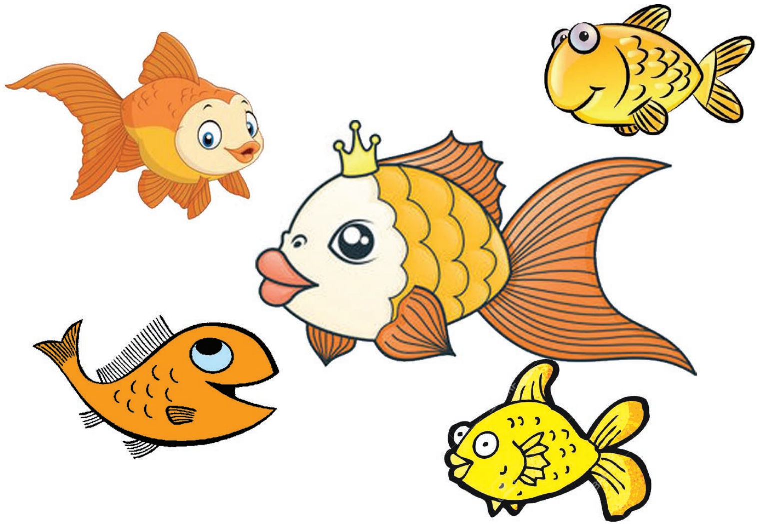

মৎস্যরানি আবার একদিন সভা ডাকলো। সেদিন ছোট-বড় সব মাছকে সভায় আসতে বলা হলো।

রানিমার নির্দেশে সবাই সভায় উপস্থিত। রানিমা বললো— আমরা যে প্রতিজ্ঞা পালন করেছি তা প্রতি বছর আমাদের বাচ্চাদের শেখাতে হবে। নতুন প্রজন্মকে শেখাতে হবে। তাই আমি তোমাদের আজ একটি ছড়া শিখিয়ে দিচ্ছি, সেই ছড়া তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের শেখাবে।

রানিমা ছন্দ মিলিয়ে ছড়া পাঠ করলো—

মাছের দল সাবধান
জাল ফেলেছে জেলের দল
জব্দ করতে তাদের ছল
সবাই জলের নীচে চল।

তারপর থেকে সবার মুখে মুখে এই ছড়া ঘুরতে লাগলো।

কিন্তু রানিমা নিশ্চিন্ত হলো না। কারণ ছড়া মুখস্ত করলেই স্বভাব বদলায় না। লোভ মাছের স্বভাব। জেলেরা খাবার ছড়ালেই মাছেরা সব সেইদিকে ছোটে। তাই মৎস্যরানি সব ছোট মাছকে পরীক্ষা করার পরিকল্পনা নিলো।

একদিন জেলেরা জলে খাবার ছড়িয়েছে। আর ছোট ছোট মাছগুলি ছড়া বলতে লাগলো।

মাছের দল সাবধান
জাল ফেলেছে জেলের দল
জব্দ করতে তাদের ছল
সবাই জলের নীচে চল।

কিন্তু তারা কেউ জলের গভীরে পালিয়ে গেল না। খাবারের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে যেতে লাগলো জেলেদের ছড়ানো সেই খাবারের দিকে। তারপর সবাই জালে আটকা পড়লো।

রানিমা তখন কচ্ছপকে অনুরোধ করলো, ভাই তুমি আমার ছানাদের বাঁচাও।

কচ্ছপ তখন জেলের পায়ে কামড় বসালো। জেলে ছটফট করতে করতে পালিয়ে গেল। সেই সুযোগে ছোটমাছেরা জালের ফাঁস গলিয়ে পালিয়ে গেল।

এই ঘটনার একদিন পর রানিমা সবাইকে ডেকে বলল— আমরা সবাই ছড়া মুখস্ত করেছি, কিন্তু ছড়ায় যা বলা আছে তা আচরণে করছি না। তাই কাল সবাই জালে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচেছি। যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে আমার শেখানো ছড়া আচরণে পরিণত করতে হবে।■

ভারতের পথে পথে

প্রয়াগ

ভারতের একটি অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান হলো প্রয়াগ। গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে এই নগরী গড়ে উঠেছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে লুপ্ত সরস্বতী নদীও এখানে মিলিত হয়েছে বলে একে ত্রিবেণী সঙ্গম বল হয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর এই স্থলেই প্রথম যজ্ঞ করেন। আর এই নগরীর প্রবর্তন করেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। হিন্দুদের চারটি মহাকুম্ভের মধ্যে একটি হলো প্রয়াগ। প্রতি বারো বছর অন্তর এখানে কুম্ভস্নান ও মেলা হয়। বর্তমানে এই স্থান এলাহাবাদ নামে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একটি জেলা এই এলাহাবাদ।

অনেক ঐতিহাসিক কারণ ও দর্শনীয় স্থান থাকলেও এখানকার প্রধান হলো ত্রিবেণী সঙ্গম ও কুম্ভমেলা। কুম্ভের পুণ্যস্নান করার জন্য সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এখানে আসে। সেজন্য প্রয়াগকে বলা হয় তীর্থরাজ।

এসো সংস্কৃত শিখি

सः इदानीमपि बालः ?

সে এখনও ছোট আছে।

भवतःअनुजायाः वयः किम् ?

তোমার বোনের বয়স কত?

भवान् मा ददातु, मा स्वीकरोतु।

তুমি দেবেও না, নেবেও না।

अन्यं कमपि न पृच्छतु।

আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না।

सः बहु वदति।

সে খুব কথা বলে।

ভালো কথা

বন্যাত্রাণে সংগ্রহ

আমরা সবাই জানি উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। অনেক বাড়িঘর জলের তলায়। মানুষেরা উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে স্কটিশচার্চ স্কুলের প্রাক্তনীরা। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড় সংগ্রহ করে বন্যাত্রাণে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। ছাত্রদের কাছেও তারা জামা-কাপড় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। তাদের এই ভালো কাজে আমি জামা দান করেছি। একটি নতুন জামা ও কিছু পুরনো জামা দিয়ে এসেছি। আমার মতো আরও ছাত্রছাত্রী তাদের জামা দান করেছে। আমার মা একটি বিছানার চাদর ও শাড়ি দিয়েছে। স্কুলের প্রাক্তনীরা ঠেলা-ভ্যান নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে অনেক জামা-কাপড় সংগ্রহ করেছে।

বুবাই নন্দী, সপ্তম শ্রেণী, কাশীবোস লেন, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) তা ণ দে গ	(১) বে তা নি দি
(২) অ ন্দ ভি ন	(২) ন্যা ব ণ ত্রা

৭ আগস্ট সংখ্যার উত্তর	৭ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) সাধারণতন্ত্র (২) রাজন্যবর্গ	(১) কচুরিপানা (২) সংশোধন

উত্তরদাতার নাম

(১) স্নেহা বিশ্বাস, গাজোল, মালদা। (২) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৫৯।
(৩) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (৪) যাদব দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৪

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো শারদীয়া

দেবী প্রসঙ্গ : ড. সীতানাথ গোস্বামী

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - বিপরিণাম
সুমিত্রা ঘোষ - চিরন্তন কাহিনি

ইতিহাসের আলোয় উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - সম্ভবামি

গল্প

এষা দে, শেখর বসু, রমানাথ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
সন্দীপ চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, বিরাজনারায়ণ রায়

রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক

প্রবন্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, এম জি বৈদ্য,
স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, অমলেশ মিশ্র, দেবীপ্রসাদ রায়, সৌমেন নিয়োগী,
রবিরঞ্জন সেন, রজত পাল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ

পুরাণ কথা

বিজয় আঢ্য

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা